আসাম প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

আসাম পর্য্যটক—
শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী প্রণীত
ঘাটেশ্বরা, জেলা—২৪ পরগণা

১৩৩২ (ভাদ্র)

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ]   [মূল্য ১৷৵০

Printed by H. C. Dey
at the Monica Press,
3 A, Radhaprosad Lane, Calcutta.

Publisher :—
Bijoy Bh. Ghose Chaudhury.
Vill. & P. O. Ghateshwara,
Dt. 24-Parganas.

কয়েকটী বিষয়ে গ্রন্থকারের বক্তব্য

আসাম প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডে যে সকল সামাজিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে, আমরা সেগুলির অনুসন্ধান লইয়াছি। আমাদের কোন মন্তব্যের বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিয়া উহাকে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা তাহা উঠাইয়া দিতে বাধ্য রহিলাম। কেননা—আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে যে, প্রকৃত বিষয় লিপিবদ্ধ করা। যিনি বা যাঁহারা প্রতিবাদ করিবেন "গ্রাম ও পোষ্ট অফিস ঘাটেশ্বরা (Ghateshwara), জেলা—২৪ পরগণা" এই ঠিকানায় রেজেষ্ট্রী করিয়া গ্রন্থকারের নামে পত্র দিলে তাহা প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কলিতা, কেওট বা কৈবর্ত্ত, বৈশ্য, কোচ, সূত প্রভৃতি জাতির জাতীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে আমরা সবিশেষ যত্নবান। তবে ঐ সকল জাতির সহানুভূতি ভিন্ন তাঁহাদিগের জাতীয় কাজ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য। আমাদের সংস্পর্শে আগত ব্যক্তিগণ যতক্ষণ না আমাদের কার্য্যে সন্তোষলাভ করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করি না—এপর্য্যন্ত করিয়াছি বলিয়া কোন অসমীয়া ভদ্রলোক আমাদের সাক্ষাতে বলিতে পারেন না। আমরা সকল শ্রেণীর অসমীয়াদিগের প্রকৃত ইতিহাস সংরক্ষণের ও পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার একান্ত পক্ষপাতী।

ধন্য কামরূপ দেশ। এককালে এখানকার গ্রামে গ্রামে প্রগাঢ় পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করায় এই দেশ সুদূর দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চি অঞ্চলের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গৃহদাহে, ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে এখানকার কত যে অমূল্য প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমরা শুনিয়াছি—আসাম গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ

সৌভাগ্যক্রমে কামরূপের পুঁথিগুলি সংরক্ষণে ব্রতী হইয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতে গৌহাটীর শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা জানি—তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই পুঁথিগুলির নাম এবং সেগুলি কাহার নিকট হইতে কি সর্ত্তে লওয়া হইয়াছিল আমরা কোন কাগজ-পত্রে তাহা দেখিতে পাই না। কয়েক বৎসর গত হইল মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সার্কুলার রোডস্থ বাটীতে গোস্বামী মহোদয়ের নিকট হস্তিবিদ্যামহার্ণব নামক এক অপূর্ব্ব পুঁথি দেখিয়াছিলাম। ইহার পাতায় পাতায় নানা বর্ণে রঞ্জিত নানাজাতীয় হস্তীর চিত্র আছে। বর্ত্তমানে ভারতের কোন স্থানে প্রাচীন কলাবিদ্যার এরূপ নিদর্শনজ্ঞাপক পুঁথি আছে কি না সন্দেহ। এই অমূল্য পুঁথিখানির মালিক কে? কোন ব্যক্তি বিশেষ, না উক্ত গোস্বামী মহাশয়, না আসাম গভর্ণমেণ্ট?

আসাম প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় সৎসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পাঠে শ্রীযুত জ্ঞলতিরাম লহকরের গাত্রদাহ হইয়াছিল। একারণ তিনি ১৯২৫ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে গৌহাটীতে শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামীর বাটীতে আমাদের সাক্ষাৎ পাইয়াই বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। আমরা তাঁহাকে ও সৎসম্প্রদায় কথা পুঁথির সমর্থনকারিগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন দশম বৎসর ষষ্ঠ সংখ্যার বাঁহী পত্রিকার ১৭৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক বাণীকান্ত কাকতি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অসমীয়া খাতি কায়স্থ কুলপ্রদীপ মনোহর দেবের নাম লোপ পাইতে বসিয়াছে। মহাপুরুষ দামোদরদেব তাঁহাকে সত্রাধিকারী করিয়া শিষ্য ভজাইবার অধিকার দিয়াছিলেন। মনোহর দেবের বংশধরগণ গৌহাটী মহকুমাস্থ 'ক্ষুদ্র মাথিবাঁহা' গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের

অবস্থা স্বচ্ছল নহে। 'আর্য্য কায়স্থ সভা'র সভ্যগণ এই মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সত্র দুইটী পুনর্নির্ম্মাণ না করিয়া দিলে তাঁহাদের জাতীয় গৌরব কি ক্ষুণ্ণ হইবে না? শ্রীযুত রণীধর চৌধুরী, শ্রীযুত প্রতাপ-নারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুত চন্দ্রমল চৌধুরী, শ্রীযুত আনন্দিরাম চৌধুরী এই কয়জন ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের মৌজা হইতে কিছু কিছু টাকা তুলিয়া মনোহর দেবের সত্র দুইটী তো পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন। আমরা জানি—রায় সাহেব রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয় সারা জীবন সদানুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিয়াছেন। উক্ত মৌজাদারগণ এই শুভকর্ম্মে ব্রতী না হইলে তাঁহারা আপন জাতির গৌরবকর কার্য্য করিলেন কি?

গোলাঘাট মহকুমার অন্তর্গত আহতগুরি সত্র (P. O. Ahatguri, Dt. Sibsagar) মহাপুরুষীয়া সত্র। ইহার অধিকারী ব্রাহ্মণ গোস্বামী—শ্রীযুত অচ্যুতচন্দ্র দেব গোস্বামী। বিগত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে ইহার 'নামঘর'টী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। উহার অস্তিত্ব সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন বোধে আমরা নিজ তহবিল হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণ অসমীয়া-গণের এবং বাঙ্গলা ও আসামের স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে কোন সাহায্য উক্ত সত্রাধিকারী মহোদয়ের নিকট প্রেরিতব্য।

আমরা আসাম হইতে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। কয়েকটী সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া আসামের যে কোন সমিতি বিনামূল্যে ঐ সকল পুঁথি চিরদিনের জন্য লইতে পারেন। কেবল রেজেষ্ট্রী খরচাদি বাবদ ।৵০ আনা পাঠাইলে আসামের যে কোন সমিতি ও লাইব্রেরীতে আমরা এক সংখ্যা আসাম প্রসঙ্গ পাঠাইয়া দিতে পারি।

৭৬ পৃষ্ঠায় আমরা শ্রীযুত প্রসন্নবাবুর নামের পূর্ব্বে "মাথিবাঁহা"

কথাটী বসাইয়াছি। অন্যান্য ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে তাঁহাদের গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ—মাখিবাঁহা নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার কায়স্থদিগের পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি জাগরূক হইবামাত্র কালের বিচিত্র গতির কথা আমাদের মনে হয়। তাহাই হইবার জন্য আমরা 'মাখিবাঁহা' কথাটী বসাইয়াছি।

আমাদের বিশ্বাস—পকোয়ার শ্রীযুত মুকুন্দমল্ল বড়ুয়া ও শ্রীযুত কালীচরণ চৌধুরী সবিশেষ উদ্যোগী না হইলে নলবাড়ী অঞ্চলে আর্য্য কায়স্থ সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়, কুমার শ্রীযুত বিষ্ণুপ্রসাদ রায় আমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক কিছু অর্থ প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎএর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত গণপতি সরকার মহাশয় নিজ ব্যয়ে দুই ফর্ম্মা ছাপাইয়া দিয়াছেন। বাণীর একনিষ্ঠ পূজারী টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি-এল ও এটর্ণী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, মাত্র এক সংখ্যা আসাম প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) আশাতীত মূল্য দিয়া আমাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত তারকনাথ মল্লিক স্বহস্তে আমাদের ফটো তুলিয়া দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বদান্যতা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই পুস্তকখানি শারদীয় পূজার পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বন্ধুবর শ্রীযুত মাণিকলাল মল্লিক কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ না হইলে—বিশেষতঃ চতুর্থ ও পঞ্চম ফর্ম্মার কিয়দংশ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদের যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, আহতগুরি-সত্রাধিকারী শ্রীযুত অচ্যুতচন্দ্র দেব গোস্বামী মহোদয় সেগুলি কৃপাপূর্ব্বক দূর করিয়া না দিলে এ বৎসর আমরা 'আসাম প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম না।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পংক্তি নং
২৩	কুমারীপূজার কাল	কুমারী-পূজার ফল	মার্জিন
২৪	বৈষ্ণব সম্প্রদায়	বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে	৪
২৮	নিবান্ধনুযায়ী	নিবন্ধানুযায়ী	১০
৩৭	কিল, চড় ও ঘুসি মারিয়া	ঘাড় মোচড়াইয়া	৬
৩৮	কলিয়া ভ্রমরা	কলিয়া ভোমরা	১০
৫৬	শ্বশুরকে শহু	শ্বশুরকে শহুর	২৫
৫৭	ভাসুরকে জেঠালত	ভাসুরকে জেঠাল	১
ঐ	কেয়োশাহু	জেশাহু	২
৫৮	কুর্ম্ম	কুর্ম্মা	১২
৬০	বাথরাণি	বাথরামি	পাদটীকা
৬৩	দমাহি	দোমাহী	১৪
৬৫	শুভঁ আহোম	সুত (বধিয়া), আহোম	১৯
৭৬	৺স্বরূপনাথ বড়ুয়া	৺সরুনাথ বড়ুয়া	১
৯১	মাধবকে	মাধবদেব	১৮

[৭৬ পৃষ্ঠার একাদশ এবং ৭৭ পৃষ্ঠার বিংশ পংক্তিতে সংশোধন-তালিকা বসান হইল]



আসাম পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

আসাম প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কামরূপ ও ৺কামাখ্যা তীর্থপ্রসঙ্গ

কামরূপ অতি প্রাচীন জনপদ। কামরূপের নামকরণ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণের একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "হর-কোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইবার পর এইখানে তাঁহারই অনুগ্রহে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম কামরূপ হইয়াছে।" বর্ত্তমান কালের সমগ্র আসাম অঞ্চল প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অংশ লইয়া গঠিত। এই আসাম 'অসম' নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। মূল রামায়ণে পাওয়া যায়, "দুর্দ্ধর্ষ রাবণ পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি অশ্মপুরী অধিকার করিয়া তাঁহার পুত্র মহীরঙ্গকে সেখানকার রাজা করেন।" কামরূপ মহীরঙ্গ দানবের দেশ বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে আজিও প্রবাদ আছে। সেখানে মহীরঙ্গকে মৈরাবণও বলা হয়। মহীরঙ্গ, মহীরাবণ, মৈরাবণ একই নাম। রাবণ সুমারিয়াণ জাতির অন্তর্গত ছিলেন। এই সুমারিয়াণ জাতি এককালে সমগ্র আসামে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব্বে কামরূপ যে তিনটী পীঠে বা বিভাগে বিভক্ত ছিল তন্মধ্যে সুমারিয়াণদিগের নামানুসারে উপর-আসামখণ্ডের নাম হইয়াছিল "সৌমার পীঠ"। আমাদের মতে 'অশ্মপুরী' হইতে অসম—তৎপরে আসাম নাম হইয়াছে।

কয়েকটী উপপুরাণ ও তন্ত্রে এই কামরূপ মহাপীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কামরূপের কামাখ্যা অঞ্চলে তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু পূর্ব্বে উহাকে "ডাকিনী পাড়া" বলা হইত। এখানকার যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর প্রবাদ ভারতের সর্ব্বত্র শ্রুত হওয়া যায়, বর্ত্তমানে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নগাঁও জেলার মায়াং নামক স্থানে না কি এখানকার কিছু কিছু যাদুবিদ্যার আভাষ পাওয়া যায়। আমরা 'মায়াং' এর বিষয় অবগত নহি। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বহুবিস্তৃত কামরূপ রাজ্য ইংরাজাধিকৃত হইবার পর যে ১২টী জেলায় বিভক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একটীর নামকরণ হইয়াছে 'কামরূপ'। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ৺কামাখ্যা তীর্থ ইহার অন্তর্গত। যোগিনীতন্ত্রের মতে "কামরূপ দেবীক্ষেত্র, তাহার সমান আর কোথায়ও নাই। দেবী অন্যত্র বিরলা কিন্তু কামরূপে ঘরে ঘরে বিরাজিতা আছেন।" কালিকাপুরাণকার বলেন—

সর্ব্ব দেবৈঃ সর্ব্ব তীর্থৈ সর্ব্ব ক্ষেত্রৈ স্তথৈবচ।
এতদ্ব্যাপ্তং কামরূপং ন ততো বিদ্যতে পরম্॥

যাহা হউক, প্রথম অধ্যায়ে আমরা কামরূপের অন্তর্গত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৺কামাখ্যা তীর্থের—দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ দেবালয়সমূহের—ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন দেবতা স্থানের বিষয় বিবৃত করিব।

৺কামাখ্যা তীর্থের প্রাচীনত্ব

গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থের ন্যায় ৺কামাখ্যাক্ষেত্র হিন্দুদিগের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বামনপুরাণের চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে নানা তীর্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই পুরাণকার কামরূপ বা কামাখ্যা তীর্থের কথা বলেন নাই। বিষ্ণুপুরাণে কামরূপের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তীর্থস্থানের বর্ণনায় কামাখ্যা বা কামরূপ কোন তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতিতেও তদ্রূপ। তীর্থস্থানের নামোল্লেখ

করিতে গিয়া উক্ত পুরাণকারেরা যখন কামাখ্যা বা কামরূপের কথা বলেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে ঐ দু'য়ের কোন স্থানই উক্ত গ্রন্থনিচয়ের বিরচিতকাল পর্য্যন্ত তীর্থরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। উহাদের পরবর্ত্তীকালে বিরচিত গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ, রাধাতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে আমরা কামাখ্যা ও কামরূপের তীর্থ-বিবরণ বিবৃত দেখিতে পাই।

অবস্থান

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত আধুনিক কামরূপ জেলাস্থিত গৌহাটী নগরী হইতে ৩ মাইল দুরে ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থ এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি সুপ্রসিদ্ধ "কামাখ্যা তীর্থ" অবস্থিত। কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে কামাখ্যা রেলওয়ে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কামাখ্যা রেলওয়ে ষ্টেশনের দূরত্ব ৪৭৭ মাইল। ৺কামাখ্যা তীর্থের অধিষ্ঠাতা ৺কামেশ্বর এবং অধিষ্ঠাত্রী তদীয় পত্নী ৺কামাখ্যাদেবী। কামাখ্যাদেবীর নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে, "কামাখ্যা পাহাড়"। আধুনিক নগাঁও জেলার শীলঘাট নামক স্থানের অন্তর্গত শারঙ্গ গিরিতে কৃষ্ণপ্রস্তরময় আর একটী ৺কামাখ্যাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। আহোম বংশীয় রাজা প্রমথ সিংহ তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

কামাখ্যা পর্ব্বতগাত্রস্থ সোপান-পথ

কামাখ্যা ষ্টেশনের পশ্চাৎ দিক্ দিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিবার সোপান-পথ ধরিয়া ঊর্দ্ধগামী হইবার কালে যুগপৎ বিস্মিত হইতে হয়। অন্যান্য দেশে সমুন্নত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিবার কালে যে-সমস্ত পথ আছে সেগুলি মানব-কৃত। কিন্তু কামাখ্যা পর্ব্বতগাত্রস্থ পথটী যেরূপ স্বভাব-সুন্দর, মসৃণ, অবন্ধুর ও প্রশস্ত তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পথটী ক্রমোচ্চ হইয়া অবক্রভাবে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে। সোপান-পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে পথিপার্শ্বের এক স্থানে পর্ব্বতগাত্রে একটী প্রকাণ্ড

গণেশমূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগকে নিতান্ত অল্প সংখ্যায় দেখা যায় না। মধ্যপথ হইতে স্বল্প দূরেই কিয়দংশ এরূপ ঋজুভাবে উন্নত যে, নবাগত ব্যক্তির পক্ষে আরোহণ ও বিশেষতঃ অবতরণ করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। পদস্খলন হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অবশিষ্টাংশ ক্রমোচ্চ ও তৎপরে বেশ সমতল। বরাবর দেহভার (balance) ঠিক রাখিয়া চলিতে হয়। পর্ব্বতগাত্র কিংবা কোন কিছু অবলম্বন করিয়া আরোহণ কিংবা অবতরণ করিবার উপায় নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সোপান-পথের উভয় পার্শ্বেই বিশালকায় পাদপসমূহ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। সোপান-পথের পার্শ্বস্থিত কোন স্থান বহু উচ্চ, আবার কোন স্থান বহু নিম্ন—চাহিলেই যেন ভীতির সঞ্চার হয়; অথচ সোপান-পথটী অবন্ধুর, ক্রমোচ্চ ও স্বাভাবিক অবস্থায় মসৃণ।

সোপান-পথ সম্বন্ধে প্রবাদ

আধুনিক রচিত 'কামাখ্যা তন্ত্র' পাঠে অবগত হওয়া যায়, "এক সময়ে নরকাসুর নামক জনৈক দুষ্টাশয় দানবরাজ কামাখ্যাদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়। দেবী তাহার পাশবিক প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য একটী কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বলিলেন—'যদি তুমি নিশাবসানের পূর্ব্বে কামাখ্যা পাহাড়ের চারিদিকে চারিটী সোপান-পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি।' দেবীর আশ্বাস বাক্যে নরকাসুর অপ্রতিহত উদ্দামে সোপান-পথগুলির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্নপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। দেবী তখন একটী মায়া কুক্কুট সৃষ্টি করিয়া উহার দ্বারা নিশাবসান-জ্ঞাপক-ধ্বনি করাইয়া অসুরাধমকে ভ্রূকুটীপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শোন্ রে দুর্ম্মতি! শোন্ ঐ নিশাবসান-জ্ঞাপক কুক্কুট ধ্বনি! আমার দ্বারা তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।' নরকাসুর তখন

ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ কুক্কুটের প্রাণ সংহার করিল। নরকাসুর তাহার নানারূপ অত্যাচার নিবন্ধন অতঃপর দেবীর হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়।”

উক্ত তন্ত্র পাঠে “কামাখ্যাদেবীর রূপমাধুর্য্য দৃষ্টে নরকাসুরের মোহের আবির্ভাব ও তজ্জন্য তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ হেতু নিধনপ্রাপ্তির বিষয়” আমরা অবগত হই।

মতদ্বৈধতা

কিন্তু দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত তেজপুরে (পৌরাণিক শোণিতপুরে) আবিষ্কৃত মহাভারতোক্ত ভগদত্ত বংশীয় হর্জ্জরের পুত্র বনমাল দেবের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে নিহত করিলে নরক-পত্নীর বিলাপে তিনি তীব্র মনবেদনা প্রাপ্ত হইয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন না করিয়া বিরত থাকিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। সেখানে উল্লেখ আছে :—কৃষ্ণেন তং নিহত্য চ সৃষ্টৌ ভগদত্ত বজ্রদত্তাখ্যৌ তস্য। সুতৌ তদ্বনিতা করুণবিলাপ হত হত হৃদয়েন॥ ৪

তেজপুরস্থ শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হর্জ্জর ৫১০ গুপ্তাব্দে (৮২৯ খ্রীঃ অব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। তৎপুত্র বনমাল দেবের রাজত্বকাল সঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। ইঁহার আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে শ্রীকৃষ্ণ ও নরকপত্নীর বিষয় যাহা উল্লেখ আছে, আমরা তাহাই বলিয়াছি। এখন দেখা যাউক—প্রতিহস্ত (প্রতিনিধি) দ্বারা জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত আর কোন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে কি না? মহাভারতে উল্লেখ আছে, হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার পর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধে এই বধূদ্বয় ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুইটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। প্রাচীনকালে হয় তো এরূপ প্রথা দূষণীয় ছিল না। আমরা ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের উৎপত্তি বিবরণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম-বৃত্তান্তের অবতারণা করিলাম।

বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে নরকের বিষয় উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে "নরক অদিতির কর্ণকুণ্ডল কাড়িয়া লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্থ দুর্জ্জয় দুর্গে চলিয়া যাইলে দেবতাদিগের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়া তাহাকে বধ করত ঐ কর্ণকুণ্ডল পুনরুদ্ধার করেন।" কিন্তু হরিবংশের মতে "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক দেবতাদিগের ঘোর শত্রু ছিল। সে হস্তীর আকার ধারণপূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মার কন্যাকে লইয়া যায় এবং তাহার উপর উপদ্রব করে। নরক গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যের কন্যাগণকে —এমন কি অপ্সরাগণকে—বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত। তাহার ১৬ হাজার স্ত্রীলোক ছিল। তাহাদের জন্য সে একটী সুবৃহৎ সুরম্য বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া ছিল। কোন দেবতা অথবা অসুর তাহার সহিত পারিয়া উঠিত না।"

কালিকাপুরাণের মতে "নরক পৃথিবী-পুত্র ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা। বিদর্ভ রাজকন্যা মায়ার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। নরক ১৬ হাজার স্ত্রীলোক হরণ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সকল লোকের উপর তাহার নানা উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেবতাগণের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমনপূর্ব্বক সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন।" যাহা হউক, কামাখ্যাতন্ত্রোক্ত পূর্ব্ববর্ণিত প্রসঙ্গটী লইয়া আলোচনার ফলে আমাদের মনে হয়, "কামাখ্যাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। অন্য কোন তন্ত্র বা পুরাণে কামাখ্যাতন্ত্রের এই উক্তির পোষকতা পাওয়া যায় না।

যে দিক্ দিয়া কামাখ্যা পর্ব্বতে আরোহণ করিলে যে ফললাভ হয় যোগিনীতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে :—

ফললাভ

পূর্ব্বস্থশ্চ গৃহস্থশ্চ আরোহেন্নীলপর্ব্বতম্।
পূর্ব্বদ্বারি যদা গচ্ছেৎ প্রাপ্নুয়াদ্‌বিপুলং ধনম॥
উত্তরে মুক্তিকামস্তু রাজ্যকামস্তু পশ্চিমে।

যদা দক্ষিণমার্গেণ আরোহেন্নীলকূটকম ॥
হতরাজ্যো ভবেৎ রাজা অন্যেষাং জায়তে ক্ষয়ঃ।
ঐশান্যে তু তদা গচ্ছেৎ বিপুলাং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥
বায়ব্যে চাগ্নিনৈর্ঋত্যে মহাভয়ঙ্করং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি পূর্ব্বদ্বার দিয়া নীলপর্ব্বতে আরোহণ করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বদ্বার দিয়া আরোহণ করে তাহার ধনলাভ হয়। উত্তরে মুক্তিলাভ ও পশ্চিমে রাজ্যলাভ হয়। যদি কেহ দক্ষিণদ্বার দিয়া পর্ব্বতারোহণ করে, তবে রাজা হইলে রাজ্যভ্রষ্ট হয়, অন্য লোকের মৃত্যু ঘটে। ঈশান কোণে আরোহণ করিলে অনেক ধনলাভ এবং বায়ু অগ্নি ও নৈর্ঋত কোণে আরোহণ করিলে মহাভয় প্রাপ্ত হয়।

কামাখ্যাতন্ত্রে কামরূপের কামাখ্যা পাহাড় "নীলাচল" বা "নীলশৈল" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাই "উত্তর নীলাচল"। "দক্ষিণ নীলাচল" (নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণী) উড়িষ্যায় অবস্থিত। কালিকাপুরাণে কামরূপের এই নীলশৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:—

নীলাচল বা নীলশৈল

লীনায়াং যোগনিদ্রায়াং ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
স নীলবর্ণঃ শৈলোঽভূৎ পতিতে যোনিমণ্ডলে ॥

অর্থাৎ শিব বলিতেছেন, পর্ব্বতরূপী আমাতে (সতীর) সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইলে এবং তাহাতে যোগনিদ্রা বিলীন হইলে সেই পর্ব্বত নীলবর্ণ হইয়াছিল। তন্ত্র ও পুরাণ মতে "নীলশৈলে দক্ষকন্যা সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হওয়ায় ইহা যোনিপীঠ নামে এক মহা পীঠস্থান। এই শৈলে কামাখ্যাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।" ব্রহ্মপুত্র হইতে নীলাচলের শিখরদেশ প্রায় ৮০০ ফিট উচ্চ।

পীঠমালায় লিখিত আছে, "যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা" অর্থাৎ কামগিরিতে যোনি পতিত হওয়ায় সেই স্থানে যোনি-

যোনিপীঠ

পীঠ ও কামাখ্যাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। কোন একখানি উপপুরাণ পাঠে আমরা অবগত হইয়াছি, "সতী দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিন্দা শ্রবণে মনঃক্ষোভে দেহত্যাগ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার শবদেহ স্কন্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক উন্মত্তভাবে মহাতাণ্ডবে প্রবৃত্ত হইলেন। উন্মত্ত ভৈরবের পদতাড়নে পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ শঙ্কিত হইলে বিষ্ণু অলক্ষ্যে সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই দেহ ছেদন করিলে উহা একান্ন অংশে বিভক্ত হইয়া ভারতের হিঙ্গলা (হিমালয়), হরিদ্বার, জয়ন্তী, জ্বালামুখী, জালন্ধর, কামরূপ, করতোয়া, কালীঘাট, কাশ্মীর, শ্রীহট্ট, উৎকল, ত্রিপুরা, প্রয়াগ, চট্টগ্রাম, নর্ম্মদা, নেপাল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহার প্রত্যেকটী পীঠস্থান নামে খ্যাত। আমরা দেখিতে পাই—মহাপীঠ ও উপপীঠগুলির অধিকাংশ বঙ্গদেশে অবস্থিত। গুপ্তরাজগণের সময়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিকতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, এই সময়েই পীঠস্থানের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের মধ্যে কামাখ্যা পাহাড়ে সতীর যোনিমণ্ডল, জয়ন্তী পরগণাস্থ ফালজুর নামক স্থানে বাম জঙ্ঘা এবং শ্রীহট্টের (১) গোটাটিকর গ্রামে গ্রীবাদেশ পতিত হয়। সতীর যোনিমণ্ডল (!) একখানি শ্বেত প্রস্তরে পরিণত হইয়া কামাখ্যাদেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে একটী গহ্বর মধ্যে প্রসারিতভাবে বিরাজমান দৃষ্ট হয়। ঐ প্রস্তরখানি দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট এবং প্রস্থে ১ ফুট। যোনিমুদ্রার উপর একটী স্বর্ণের মুকুট আছে। ইহা দক্ষিণমুখী।

কোন উপপুরাণের মতে "দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর

(১) শ্রীহট্ট—আধুনিক ভৌগোলিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা মতে এই অঞ্চল এককালে সাগরগর্ভে ছিল।

সতীর দেহত্যাগ রহস্য

দেহত্যাগ, মহাদেবের শবদেহ স্কন্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য, চক্রদ্বারা বিষ্ণু কর্ত্তৃক অলক্ষ্যে তাহার ছেদন ও সেই কর্ত্তিত অংশ পতনে পীঠস্থাপন” বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কালিকা-পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় “সতী পতিনিন্দা শ্রবণান্তর যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন। ইহাতে তদীয় প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। অতঃপর মহাদেব সতীর শবদেহ স্কন্ধে লইয়া বিলাপ করত পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার উন্মত্ত-ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শিবগাত্র স্পর্শ করত এই শবশরীর গলিয়া পড়িবে না ভাবিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি যোগ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুণ্যতীর্থ করিবার জন্য তাঁহারা উহাকে খণ্ড খণ্ড করত ভূতলের নানাস্থানে ফেলিয়া দিলেন। সতীর অঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইল সেই সকল স্থান পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। মহাদেব সেই সকল স্থানে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।” স্মরণাতীতকালে বিরচিত ‘গোপথ ব্রাহ্মণে’ উল্লেখ আছে, “সতী যজ্ঞকালে পতিনিন্দা শ্রবণে মনঃক্ষোভে দেহত্যাগ করেন।” শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে উল্লেখ আছে যে, ঐ সময়ে উক্ত কারণে তিনি অনলে প্রাণত্যাগ করেন। স্কন্দপুরাণের মহেশ্বর খণ্ডের অন্তর্গত কেদারখণ্ডে লিখিত আছে যে, সতী দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিন্দা শ্রবণে হুতাশনে প্রবেশ করেন। সেখানে উল্লেখ আছে :—

যো নিন্দতি মহাদেবং নিন্দ্যমানং শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকে যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ২১
তস্মাত্ত্যক্ষ্যাম্যহং দেহং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। ২২
এবং মীমাংসমানা সা শিবরুদ্রেতিভাষিণী।
অপমানাভিভূতা সা প্রবিবেশ হুতাশনম্॥ ২৩

—তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মহাদেবকে নিন্দা করে এবং যাহাকে সেই নিন্দা শুনিতে হয়, এই উভয় ব্যক্তিই যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর নরকে বাস করিয়া থাকে; অতএব দেহত্যাগ করাই আমার কর্ত্তব্য। আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব। এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সতী মুখে শিব, রুদ্র ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং অপমানে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ হুতাশনে প্রবেশ করিলেন।' কালিকাপুরাণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, স্কন্দপুরাণ বা শিবপুরাণে বিষ্ণুকর্ত্তৃক অঙ্গচ্ছেদের কথাই নাই। অধিকন্তু কালিকাপুরাণে সতীর যোগবলে, গোপথ ব্রাহ্মণে মনঃক্ষোভে, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং স্কন্দপুরাণে অনলে প্রাণত্যাগের উল্লেখ আছে। কূর্ম্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞের বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বামণ ও কূর্ম্মপুরাণকারদ্বয় সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক, সতীর অঙ্গচ্ছেদ ও পীঠস্থাপনা পুরাণতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচার-সাপেক্ষ। তাঁহার দেহত্যাগের ঘটনা কোন্ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সতীর পিতা বৈদিক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; কারণ তাঁহার নাম বেদে বিদ্যমান আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

যোনিপীঠের ইতিহাস ও পূজা

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, "বহুকাল পূর্ব্বে মেক্সিকো, পেরু, চিলি, মিশর প্রভৃতি দেশে লিঙ্গ ও যোনিমুদ্রার পূজা প্রচলিত ছিল।" স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ করিয়া তাহাদিগের যোনি পূজার (২) বহুল প্রচলন কাপালিক ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদিগের মধ্যে ছিল। সে সকল অশ্লীল বিষয় আমাদিগের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া পাঠকদিগকে

(২) যোনিপূজা—যোনিতন্ত্র, বৃহৎ যোনিতন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে এবং চীনাচার মহাচীনাচার, সময়াচার গ্রন্থে আনুষঙ্গিকভাবে যোনিপূজার বিষয় বিবৃত আছে।

কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান ব্যতীত আর কিছু উল্লেখ করিতে আমরা বিরত হইলাম।

৺কামাখ্যা তীর্থপ্রসঙ্গে আমরা তত্রস্থ যোনিমণ্ডলের পূজার কথাই বলিব। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে যে প্রস্তরময় যোনি মুদ্রার পূজাবিধি প্রবর্ত্তিত আছে, আধুনিক কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন, "পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের নিকট হইতে তাহা গৃহীত। কামাখ্যার স্থায় কামরূপের হাজো ও মঙ্গলচণ্ডী দেবালয়ের শিলামূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।" আমরা ইহাও শুনিয়াছি, "বৌদ্ধতন্ত্রে এই যোনিমুদ্রা প্রজ্ঞাদেবী বা জগন্মাতা নামে অভিহিত হইয়াছে।" যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, কাপালিক বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-দিগের প্রজ্ঞাদেবী এক্ষণে হিন্দুদিগের নিকট পূজিত হইতেছে তাহা হইলে বলা যাইতে পারে (!) কামাখ্যা মন্দির উক্ত যুগের একটী নিদর্শন।

প্রজ্ঞাদেবী

মিষ্টার এফ, ডাউসন তদীয় Classical Dictionary of Hindu Mythology (পৃঃ ২৯৮)তে বলেন, "Siva is represented by his symbol the Linga or phallus, typical of reproduction : and it is under this form alone or combined with the Yoni or female organ, the representative of his Sakti or female energy, that he is everywhere worshipped. মিষ্টার জে, সি, ওম্যানের Mystics, Ascetics and Saints of India নামক পুস্তকে উল্লেখ (পৃঃ ১১৪) আছে, "Sakti worship, that is, the worship of the *female* energy and in Nature, having the *Yoni* and *Yantra* for the accepted symbols, is not perhaps as old in India as the phallic cult of Siva ; but we know it was flourishing there in the eighth and ninth centuries A. D. and has a very consi-

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয়ের অভিমত

derable following at the present time. The written authorities upon which this cult is based are certain Purans—for example, the Brahama Vaivartha, Skanda and Kalika ; but the most important Scriptures of the Saktas are the Tantras, which they regard as a fifth Veda."

কামাখ্যা বৌদ্ধপীঠ নহে। অনুমান ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উক্ত নরকাসুর কর্ত্তৃক এখানকার যোনিপীঠ স্থাপিত হইয়াছিল। এই

আমাদের মন্তব্য

প্রকার লিঙ্গ ও যোনি পীঠ যে অসুর জাতীয় লোকেরা স্থাপন করিয়াছিল কালডীয়া (৩) ইতিহাসে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের গবেষণা মতে নরকাসুর দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত পানি ফিনিসিয়ানদিগের জ্ঞাতি-ভাই ছিল। কারণ বৌদ্ধযুগে আর্য্যেরা প্রবল প্রতাপান্বিত সুমারিয়াণ বা দ্রাবিড়ীদিগকে অসুর, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। আর্য্যেরা যে অসুর জাতির ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর নরকাসুর যখন কামাখ্যা পাহাড়ে যোনিপীঠ স্থাপন করেন, বশিষ্ঠ ঋষি তখন যে কামাখ্যাদেবীকে শাপ দিয়াছিলেন, যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। অসুর জাতি ব্যতীত আর্য্যেরা যে লিঙ্গ, যোনিপূজা করিত না, ইহার অপর প্রমাণ—বাণাসুর যখন দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে বিশ্বনাথে এক কোটী প্রস্তরখণ্ড ধরিয়া লিঙ্গ, যোনিপীঠ স্থাপন করিয়াছিল, সে সময় কুমুদ, কৌস্তভ নামক দুইজন ঋষি তাহার এইরূপ কার্য্যে আপত্তি করিয়া শাপ দিয়াছিলেন। যোগিনী তন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে একথার উল্লেখ আছে। অসুরদিগের ধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্মভুক্ত করাকেও তন্ত্র বলে। তন ধাতুর অর্থ বিস্তার করা।

(৩) কালডীয়া—এই প্রাচীন বিশাল জনপদ (Chaldea)টী Asiatic Tu অন্তর্গত।

আর্য্যপ্রভাব যখন হীন হইয়া পড়িল সে সময় আমাদের সুচতুর ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের দোকান পাতিয়া অনার্য্য জাতিদিগকে ধর্ম্মের দ্বারা শাসন করিবার অভিপ্রায়ে পুরাণ ও তন্ত্র সৃষ্টি করেন।

কামাখ্যাস্থ যোনিপীঠ পূজায় ও গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কামাখ্যাতন্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

পার্ব্বতীর প্রশ্নে মহাদেব বলিতেছেন—

শৃণু দেবি মুব্রাভদ্রে মদীয়ে প্রাণবল্লভে।
যোনিরূপা মহাবিদ্যা কামাখ্যা বরদায়িনী॥

* * * *

—প্রথম পটল।

কৃত্বা সংকল্পসিদ্ধৌ তৎ কামেষু পাঠয়েদ্‌বুধঃ।
পঠিত্বা শ্রাবয়েৎ বাপি শৃণোতি পূজয়েৎ যদি॥
তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমৎকালীপ্রসাদতঃ।

—নবম পটল।

কামাখ্যাস্থ যোনিপীঠে সকল শক্তিপূজা হয়। তৎপ্রসঙ্গে কালিকা পুরাণের ৬২ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে :—

* * * *

নীলকূটে ময়া সার্দ্ধং দেবী রহসি সংস্থিতা। ৭৬
সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণযোনিমণ্ডলম্॥
শিলাত্বমগমৎ শৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা। ৭৭
সংস্পৃশ্য তাং শিলাং মর্ত্ত্যো হ্যমর্ত্ত্যত্বমবাপ্নুয়াৎ॥

কামাখ্যার শিলামাহাত্ম্য সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

তস্যাঃ শিলায়াঃ মাহাত্ম্যং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা।

* * * *

সা চাপি তত্র প্রত্যহং পঞ্চমূর্ত্তিধরা ভবেৎ।

* * * *

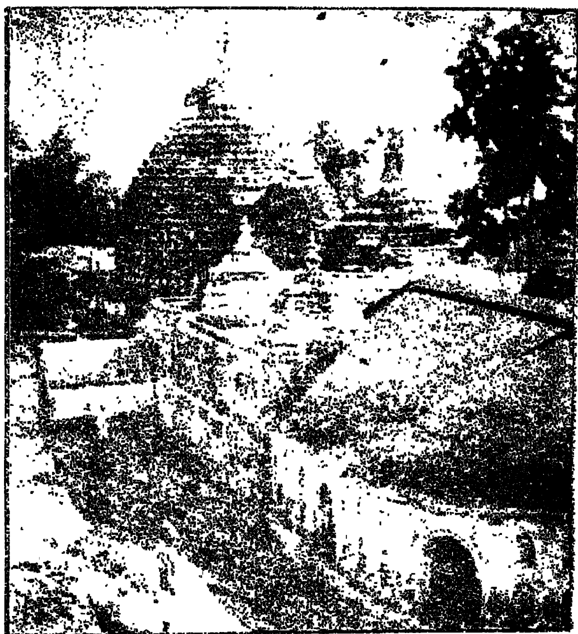
কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
সারদাথ মহালোকা কামরূপগুণৈর্যুতা ॥ ৮৪
ময়ি লিঙ্গত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।

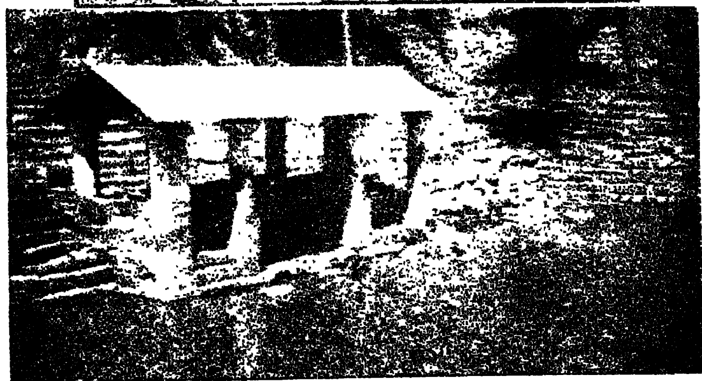
* * * *

শ্রুতঃ পীঠক্রমস্তাত দেব্যাঃ পূজাক্রমং ততঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি মূর্ত্তীনাম্ পঞ্চানামপি শঙ্কর ॥

৺কামাখ্যাদেবীর মন্দির

কামাখ্যা পাহাড়ের উপরিভাগে কামাখ্যাদেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির। এইরূপ জনশ্রুতি "কামদেব এই স্থানে মহাদেবের কৃপায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় দেবীর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।" এই মন্দিরের গাত্রদেশে চৌষট্টি যোগিনী ও অষ্টাদশ ভৈরবমূর্ত্তি খোদিত ছিল। তাহাও কামদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া এখানকার পাণ্ডাগণের নিকট অবগত হওয়া যায়। বিগত ১৩২২ বঙ্গাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম উহাদের নিম্নার্দ্ধ বিদ্যমান দেখিয়াছি। এই মন্দির নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র। উহার মধ্যস্থল দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আট হাত। মন্দিরটীর দুইটী দ্বার আছে। উহা "সিংহদ্বার" নামে অভিহিত। প্রথম দ্বারের সম্মুখভাগে একটী বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকে। দ্বিতীয় সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার কালে মন্দির মধ্যে প্রাচীরের একস্থানে কুলুঙ্গী (recess)র মধ্যে একটী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পাণ্ডাগণ উহাকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি (?) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ ঘোর অন্ধকারময়—যেন পাতালপুরী। একারণ আলোক সাহায্যে দর্শকগণকে দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। ৺কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কেদারেশ্বরের মন্দির।'





[কামাখ্যার মন্দির ও তন্নিম্নে সৌভাগ্যকুণ্ড—১৪ ও ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শাক্তধর্ম্মপরায়ণ কোচরাজ নরনারায়ণ যোগিনীতন্ত্রে কামাখ্যাদেবীর নাম প্রাপ্ত হইয়া মনের আবেগ বশতঃ বহু আয়াসে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্থান আবিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি সেখানে এই দেবীর মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নরনারায়ণ কর্ত্তৃক সেখানে এই মন্দির নির্ম্মাণের প্রাক্‌কালে জনমানবের সমাগম ছিল না, এবং দেবীর কোনরূপ সেবা-পূজাও হইত না। একারণ ঐ স্থানটী গহন কাননে পরিণত হইয়া ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে হিন্দুজাতি চিরদিন ধর্ম্মের জন্য লালায়িত, কি কারণে তাঁহাদিগের সকলেই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া আধুনিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন—"কামাখ্যাদেবী বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত না হইলে তিব্বত ও ভুটানের বৌদ্ধগণ আজিও প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া এই দেবীর পূজা প্রদান করিবেন কেন? পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কামরূপস্থ বৌদ্ধদিগের যে বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়, তাহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপপ্রাপ্তি ঘটিতে থাকিলে সেখানকার বৌদ্ধগণ কামরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে তথায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্মে কিছুই সারত্ব নাই বুঝিয়া সেখানকার লোকেরা উহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। ৺কামাখ্যা বৌদ্ধ-কুলদেবী বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন বোধে সেখানে যাইতে বিরত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে স্থানটী জনমানব-সমাগম বিরহিত হওয়ায় প্রাকৃতিক নিয়মে সেখানে জঙ্গল বসিল—মন্দির বিধ্বংস হইল; ক্রমে সেখানকার যাবতীয় চিহ্ন লোপ পাইল। একারণ যোগিনীতন্ত্রোক্ত ৺কামাখ্যাদেবীর স্থান-নির্দ্দেশে কোচরাজকে বহু আয়াস পাইতে হইয়াছিল।"

নরনারায়ণ কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মাণ

কোন কোন ঐতিহাসিকের অনুমান

কিন্তু আমরা বহু গবেষণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন। ৺কামাখ্যা-মন্দির বৌদ্ধদেবালয় নহে।

এখন ইতিহাসের দিক্ দিয়া উক্ত কোচরাজ কর্ত্তৃক ঐ মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণকাল নির্ণয় করা যাউক। বর্ত্তমান ৺কামাখ্যা-মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবালয়-গাত্রে সুরক্ষিত প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত-রূপ উৎকীর্ণ আছে—

পুনর্নির্ম্মাণকাল

লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচরিতঃ কন্দর্প রূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ।

প্রসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দ-
ভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপলেন
শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে॥

* * *

অর্থাৎ—যিনি করুণা বিতরণে লোকবান্ধব সূর্য্যের সদৃশ—ধনুর্ব্বিদ্যায় পার্থস্বরূপ, নানাশাস্ত্রালোচনায় যাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, রূপে কন্দর্প সদৃশ সেই কামাখ্যাদেবীর চরণ-সেবক শ্রীমল্লদেব জয়যুক্ত হউন। তাঁহার অনুজ শ্রীশুক্লদেব ১৪৮৭ শকাব্দে মনোরম নীলশৈলে উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায়, ১৪৮৭ শকে (১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে) শুক্লদেব (শুক্লধ্বজ) নীলশৈলে ৺কামাখ্যাদেবীর এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রবাদ আছে, "কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের প্রত্যেক ইট এক রতি স্বর্ণসহ গাঁথা হইয়াছিল।" উক্ত মল্লদেব নামান্তর মল্লধ্বজ বা নরনারায়ণ কোচ বংশের আদি রাজা বিশু বা বিশ্বসিংহের পুত্র। বিশ্বসিংহ হারিয়া

মণ্ডল (৪) নামক জনৈক 'মেছ' সর্দারের দ্বিতীয়া কন্যা হিরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যোগিনীতন্ত্রে বিশ্বসিংহের নাম পাওয়া যায়। তৎপুত্র রাজা নরনারায়ণ মোগলকুলতিলক সম্রাট জেলালুদ্দিন মহম্মদ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। মিঃ রবিনসন্ ও স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের মতে, "নরনারায়ণ ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার এডোয়ার্ড গেইট বাহাদুর তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির আরম্ভকাল ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিবার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছেন," It is less easy to come to a definite conclusion regarding his date of accession." নরনারায়ণের রাজত্বের শেষ কাল যে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ছিল, তৎসম্বন্ধে তিনিও স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কালাপাহাড় কর্ত্তৃক মন্দির ধ্বংস

স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুরের 'আসাম বুরঞ্জী' পাঠে অবগত হওয়া যায়, "রাজা নরনারায়ণের কামরূপে আধিপত্যকালে বাঙ্গালার নবাব সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।" ইহা সর্ববাদীসম্মত, হিন্দুদেবালয়সমূহের বিলোপসাধনের জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কালাপাহাড় কোন নারীর মর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। নরনারায়ণ তাঁহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া সান্ধস্থাপন করিতে বাধ্য হন। রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তদীয় আসাম বুরঞ্জীতে বলেন, "কালাপাহারর এই দেশত পোরাসুঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠান বা কালযবন নাম প্রচলিত আছে। এওঁ ধর্ম্মবিদ্বেষী বুলি

(৪) হারিয়া মণ্ডল—ইনি মেছ জাতীয় বলিয়া কুচবিহারের ইতিহাসে উল্লেখ নাই।

এতিয়া নৈকে মানুহে কয়। কালাপাহাৰৰ আক্রমৰ বিবৰণ গুরু ভটিমাত আছে।" এই গুরু ভটিমা পুঁথিখানি আমরা দেখি নাই। যাহা হউক, আসাম বুরঞ্জীর মতে, রাজা নরনারায়ণ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মন্দিরটী পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।" কামাখ্যার পাণ্ডাগণও যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকেন, "রাজা নরনারায়ণের এই পুণ্যময় কার্য্যের জন্য তদীয় প্রস্তর মূর্ত্তিটী স্মৃতিস্মারকরূপে অদ্যাবধি মন্দির মধ্যে সংস্থাপিত রহিয়াছে।" যাহা হউক, পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লদেব 'শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্ক সংখ্যা' অর্থাৎ ১৪৮৭ শকাব্দে বা ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নীলশৈলে কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

প্রমাণাভাব

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কামাখ্যার মন্দির ধ্বংসের যে উল্লেখ উক্ত আসাম বুরঞ্জীতে পাওয়া যায়, তাহা কতদূর সত্য এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, "সুলেমান কারাণি ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। কালাপাহাড় তাঁহার সেনানায়ক ছিলেন। মুসলমান ইতিহাস 'রিয়াস্ উস্ সালাতিন' অনুসারে "সুলেমান কারাণি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার আক্রমণ করেন।" তাহা হইলে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কালাপাহাড় কিরূপে ঐ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

দেবীর প্রকৃত মন্দির ব্যতীত উহার সংলগ্ন আরও দুইটী নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটীর নাম "পঞ্চরত্ন" আর অপরটীকে "নবরত্ন" বলা হইত। নবরত্ন একটী প্রকাণ্ড দালানের মত ছিল। বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দ্বারবঙ্গেশ্বর ৺কামাখ্যাদেবীর মন্দির সংস্কার করিয়া দিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুচবিহারের

তৎকালীন মহারাজা স্যার 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাহাতে সম্মতিপ্রদান করেন নাই।

৺কামাখ্যা দেবী

কামরূপং মহাপীঠং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি। ৮৯।১৬

অর্থাৎ 'কামরূপ মহাপীঠ, সেখানে ৺কামাখ্যা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।' কামেশ্বর ও কামাখ্যা দেবী উচ্চ মঞ্চোপরি পশ্চিমমুখ করিয়া বিরাজমান। এই কামাখ্যা দেবী এক্ষণে ধাতুময় বিগ্রহ--সিংহের উপর শবাকারে শায়িত শিবের নাভিদেশ হইতে উর্দ্ধোত্থিত একটী পদ্মের উপর সমাসীনা (৫)। তিনি ষড়াননা, দ্বাদশভূজা এবং অষ্টাদশ চক্ষুবিশিষ্টা। কোচরাজ নরনারায়ণের আদেশে তদীয় ভ্রাতা শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। একারণ কোচরাজ-বংশধরগণ কামাখ্যা দেবীকে আপনাদের কুলদেবী বলিয়া থাকেন।

৺কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে:— "ভগবানুবাচ—

কামাখ্যা নামকরণ

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥

অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন -এই মহাদেবী অভিলাষ পুরণের জন্য আমার সহিত নীলকূটে আগমন করায় কামাখ্যা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গ-নাশিনী হওয়ায় কামাখ্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

---

(৫) সিংহ—বিষ্ণু; শব—শিব; পদ্ম—ব্রহ্মা: অর্থাৎ কামাখ্যা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উপর বসিয়া আছেন।

৺কামাখ্যা দেবীর পূজা করিলে যে ফললাভ হয়, তৎসম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

পূজার ফল

কামাখ্যাং মহামায়াং যঃ পূজয়েত্তি মানবঃ।
সর্ব্বকামমিহ প্রাপ্য পরলোকে শিবো ভবেৎ ॥
নহি তৎসদৃশং কার্য্যমন্যত্র ভুবি বিদ্যতে।
বাঞ্ছিতার্থং নরো লব্ধা চিরায়ুর্ভবতি ধ্রুবম্ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামাখ্যা মহামায়াকে পূজা করে, সেই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু লাভ করে এবং পরলোকে শিবত্বপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে এতাদৃশ অন্য কোন কাজ নাই।

কোচরাজ-বংশধরের দেবীদর্শনে নিষেধ

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, কামাখ্যাদেবী কোচবংশের কুলদেবী। রাজা নরনারায়ণের সময় হইতে কোচরাজ-বংশধরগণের এই দেবী-মূর্ত্তি দর্শন করা নিষেধ হইয়া গিয়াছে। আসাম বুরঞ্জীতে এই নিষেধ সম্বন্ধে লিখিত আছে, "কোচবিহার নিবাসী কেন্দুকলাই নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যখন কাঁশী-ঘণ্টা লইয়া দেবীর পূজা করিতেন তখন তিনি তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ইহা অবগত হইয়া উক্ত সময়ে তাহা দেখিবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে নিরতিশয় অনুরোধ করেন। পরে তিনি ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে একদিন যথাকালে একটী রন্ধ্রের মধ্য দিয়া তাহা দর্শন করিবা মাত্র দেবী সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি ক্রোধোন্মত্তা হইয়া ভীষণ চপেটাঘাতে কেন্দুকলাইয়ের মস্তক বিচূর্ণ করিয়া দেন এবং দৈববাণীর দ্বারা কোচরাজকে আদেশ করেন যে, তিনি কিংবা তাঁহার কোন বংশধর আর কখনও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিবেন না।" তদবধি কুচবিহার, বিজনী, বেলতলা, দরঙ্গ প্রভৃতি স্থানের কোন কোচ-রাজবংশধর কামাখ্যা পাহাড়ে আরোহণ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বে

বলিয়াছি, "কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে কামাখ্যা রেলওয়ে ষ্টেশন অবস্থিত। পাণ্ডুঘাট হইতে এখান দিয়াই শিলং যাইবার মোটর-রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।" পাছে দেবীর পূর্ব্বকোপ বশতঃ কোনরূপ মহানিষ্ট সংঘটিত হয় একারণ এই পথ দিয়া যাতায়াত করিবার কালে কোচ-রাজবংশীয়েরা কামাখ্যা পাহাড় চক্ষুর অন্তরালে না হওয়া পর্য্যন্ত গাড়ীর কামরাটী অতিশয় সতর্কতার সহিত মোটা কাপড় দ্বারা বেষ্টন করিয়া লন। পাঠক! এই ব্যাপারটী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

সৌভাগ্যকুণ্ড

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অন্তর্গত জমি প্রায় ১০।১২ বিঘা। বিগত ১৩২২ বঙ্গাব্দে আমরা এই জমির চারিদিকেই প্রাচীর বেষ্টিত দেখিয়াছি। তন্মধ্যে সৌভাগ্যকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী আছে। এই কুণ্ডের দক্ষিণ ঘাট প্রস্তরদ্বারা বাঁধান উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া প্রথমে শ্রাদ্ধ তৎপরে পীঠপূজা ও কুমারীপূজা করিতে হয়। শ্রাদ্ধের সমস্ত দ্রব্যই পাণ্ডারা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। "মৎস্যসূক্তে" লিখিত আছে, "সৌভাগ্যে বিধিবৎ স্নাত্বা শক্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ", অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিলে অর্দ্ধ-ইন্দ্রত্ব লাভ করা যায়। সৌভাগ্যকুণ্ডের অগ্নিকোণে অল্পদূরে "কম্বলাখ্য" নামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই লিঙ্গ সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে, "কম্বলাখ্যং শিবং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ" অর্থাৎ কম্বলাখ্য নামে অভিহিত শিব দর্শন করিলেই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। দেবীর পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানান্তে "নমস্তে কম্বলেশায় মহাভৈরবরূপিণে। অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ কামাখ্যাদর্শনং প্রতি।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করাইয়া কামাখ্যা মন্দিরাভ্যন্তরে

কম্বলাখ্য

লইয়া যান। সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিবার পূর্ব্বে পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে বলিয়া দেন, "এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে মানবের

স্নানের ফল

দুরদৃষ্ট খণ্ডন হয় এবং স্নানকারী ব্যক্তি সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। মাস ও তিথি ভেদে সৌভাগ্যকুণ্ডে অবগাহনের ফল যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে. "তুলা-বিষুব-সংক্রান্ত্যাং যস্তু স্নানং সমাচরেৎ। অভার্য্যা লভতে ভার্য্যামপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ" অর্থাৎ মাঘ মাসে (!) বৈশাখ ও কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে অভার্য্যার ভার্য্যালাভ এবং পুত্রহীন ব্যক্তির পুত্রলাভ হয়। উক্ত তন্ত্রানুযায়ী সৌভাগ্যকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে স্নান করা

জলের অবস্থা

একেবারে নিষিদ্ধ। এই কুণ্ডস্থিত জল অধিকাংশ সময় কটিদেশ পর্য্যন্ত থাকে। নানা জাতীয় যাত্রীর স্নান, আচমন, বস্ত্র ধৌত প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর স্বল্প পরিমাণ জল এত মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে, উহা মুখে দিতে বড় একটা স্পৃহা হয় না। যাত্রিগণ ভক্তিপূর্ণ মনে এই কুণ্ডে অবগাহন না করিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত হয়, ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

কুমারীপূজা

তন্ত্রমতে "কুমারী-পূজা শক্তি পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বিশেষ। ঋতুমতী না হইলে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা কন্যা কুমারী। সকল জাতির লোকেরা কুমারী পূজা করিতে পারেন।"

কুমারীকাল

অদ্যাবধি ৺কামাখ্যা তীর্থে বিশেষরূপে কুমারীপূজা হইয়া থাকে। সৌভাগ্যকুণ্ডের তীরদেশস্থ বেদীর উপর বসিয়া কুমারী পূজা করা হয়। কুমারী প্রণামের মন্ত্র পাঠ করিবার পর তাহাকে দক্ষিণা দিয়া ভোজন করান হয়। কুমারীপূজা করিলে যে ফললাভ

হয় তৎসম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রের একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

কুমারীপূজার কাল

পূজিতৈকা কুমারী চেদ্দ্বিতীয়ং পূজনং ভবেৎ।
কুমারী-পূজনফলং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥ ৩৩
কুমার্য্যশ্চ শক্তয়শ্চ সর্ব্বমেতচ্চরাচরং।
একা চেদ্ যুবতী দেবি পূজিতা স্বাত্মলোকিতা
সর্ব্বা এব পরা দেব্যাঃ পূজিতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ৩৪

অর্থাৎ যদি নরগণ একটী কুমারী পূজা করে, তবে তাহার ফললাভ হয়। হে দেবি! কুমারীপূজার ফল আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে অম্বিকে কুমারীগণ ও শক্তিগণ এই অখিল চরাচরস্বরূপ। যদি একটী যুবতীর পূজা করা যায়, তবে তদ্দ্বারা সমস্ত দেবদেবীগণ পূজিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কুমারীপূজার প্রচলন আছে কিনা?" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় তদীয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (পূর্ব্বাংশ ৮৮ পৃষ্ঠা) বলেন, "অনেক উপধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে; তাহাদের সংখ্যা লইয়াই বৈষ্ণব সংখ্যা পুষ্ট হইয়াছে। এই উপধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিশোরী-ভজন অবলম্বিগণের সংখ্যাই অধিক। শুদ্ধ বৈষ্ণবমতের সহিত সহজ বা কিশোরী ভজন মতের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই।" চৌধুরী মহাশয়ের শেষোক্ত কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, "শুদ্ধ বৈষ্ণবমতের সহিত উপধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহজ বা কিশোরী-ভজন মতের অনেকটা ঐক্য আছে।" অতঃপর তিনি এই উপধর্ম্মাক্রান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির একজন সঙ্গিনী সহ গভীর রাত্রে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অসাক্ষাতে জঘন্য উপাসনার কথা বলিয়াছেন। তৎকালে প্রধানা রমণীর সম্মুখে যে ভোজ্যদ্রব্য উপস্থিত করা হয় তিনি তাহা আস্বাদন করিলে পর

বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীর "কিশোরী-ভজন"

ভক্তবর্গের মধ্যে এই প্রসাদ নাকি বিতরিত হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চল বাঙ্গালা হইতে খারিজ হইয়া ইংরাজ আমলে আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় বাঙ্গালা হইতে সেখানে তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই "সহজভাব"এর আমদানি হইয়া থাকিবে। অসমীয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ভক্তগণপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রখ্যাত। তাঁহাদিগের বিধানমতে কুমারী বা কিশোরী-ভজন একেবারেই নাই।

স্যার এডোয়ার্ড গেইট বাহাদুর তদীয় আসামের ইতিহাসে (পৃঃ ৫৬) লিখিয়াছেন, "কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্যূন ২৪০টী নরবলি দেওয়া হইয়াছিল।" ইংরাজ আমলে কামাখ্যায় নরবলি রহিত হইয়া গিয়াছে।

বলিদান

কালিকাপুরাণ-কর্ত্তা ৺কামাখ্যা ও ভৈরবের নিকট জীবজন্তু ও সকল জাতীয় পক্ষী বলি দিবার বিধান দিয়াছেন। কালিকাপুরাণের (৬৭ অধ্যায়) মতে নরবলি দিলে তিন হাজার বৎসর দেবীর কৃপালাভ হয়; কিন্তু যোগিনীতন্ত্রের কোন স্থানে নরবলির বিধান নাই। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পার্শ্বস্থিত স্থানে তাঁহারই উদ্দেশ্যে মেষ, মহিষ, হংস, পারাবত ও বন্য মোরগ বলি দিবার ব্যবস্থা অদ্যাবধি আছে। পূর্ব্বে এখানে বন্য শূকর বলি দেওয়া হইত।

হায় মাতঃ কামাখ্যে! কত যে নররুধির দানে তোমার মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এক্ষণে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! তান্ত্রিকগণের বরলাভ কামনায়, সাধনাসিদ্ধির ভানে তোমার নিকট নরবলি যেন হিন্দুর নির্ম্মল উপাসনা-পদ্ধতিতে একটি কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া গিয়াছে। সত্যের আভাষ আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। ধর্ম্মের নামে এত বড় প্রতারণা! এ প্রকার হৃদয়বিদারক নৃশংসতা চরমে উঠিলে ভগবান আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তাই তিনি নগাঁও

এর বটদ্রবা গ্রামে কুসুম্বর ভূঞার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিলোপসাধনে ব্রতী হইলেন।

শুনা যায়, প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে অম্বুবাচীর কয়দিন কামাখ্যা দেবী রজঃস্বলা হন। তৎকালে যে পাণ্ডার পালা থাকে তিনি উৎকৃষ্ট সিল্কের রক্তবস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করাইয়া থাকেন। অন্যান্য পাণ্ডাগণ ইহার সম্মুখে এই কয় দিন নিজ নিজ ক্ষৌম রক্তবস্ত্র রখিয়া দেন। তাঁহারা ইহার কিয়দংশ যাত্রীদিগকে প্রদানপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, মায়ের এই রক্তবস্ত্র অতি শুভ ফলপ্রদ। কেহ ভক্তি সহকারে ইহাকে সঙ্গে রাখিলে তাহার মামলা-মকর্দ্দামায় জয়লাভ, মনস্কামনা পূর্ণ ও নানাবিধ দুর্দ্দৈব খণ্ডন হইয়া থাকে। যাহা হউক, এ সংসারে মহাপুরুষ ব্যতীত এমন কি কেহ আছেন যিনি তাঁহার দুরদৃষ্ট খণ্ডন করিতে চাহেন না? যাত্রিগণ ঋতু-বস্ত্রের এই সকল মাহাত্ম্য শুনিয়া নিরতিশয় ভক্তিসহকারে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ের মূলে হয়তো কোন গুহ্য তথ্য নিহিত থাকিতে পারে। আমরা হিন্দু; ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি দ্বিধাভাব প্রকাশ করিলে অনেক সময় তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট নিন্দিত ও হেয় হইতে হয়। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর" ইহাই হইতেছে আমাদের পিতৃ-পিতামহদির প্রাণের কথা। সে দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন আসিয়াছে অনুসন্ধানের যুগ, মামুলী কথা আজকাল কেহই শুনিতে চান না। ইতিহাস পাঠে আমরা কামাখ্যাদেবী সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইয়াছি তদনুযায়ী বলিতে পারা যায় যে, কোচরাজ নরনারায়ণের সময় হইতে তিনি হিন্দুদিগের নিকট জগন্মাতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কামাখ্যায় ব্যতীত সন্তান হইয়া দেবীর ঋতুবস্ত্র স্পর্শ করিবার বিধান কোন হিন্দুশাস্ত্রকার দিয়াছেন কিনা অথবা আর কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসে কিংবা কোন

জাতির ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে কিনা আমরা তাহা অবগত নাই। একারণ আমরা বিশেষজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর ইহার মিমাংসার ভার অর্পণ করিলাম।

যাত্রীসমাগম কাল

৺কামাখ্যা তীর্থে অনেকগুলি উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অম্বুবাচী, দেবধনী, দুর্গোৎসব, পুংসবন ও বাসন্তিক উৎসবোপলক্ষে এবং গ্রহণাদি যোগের সময় ভারতের নানাস্থানে হইতে এত অধিক যাত্রী-সমাগম হয় যে, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রতি বৎসর পৌষমাসে কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে ৺কামেশ্বর ও ৺কামেশ্বরী (৺কামাখ্যা) এই উভয় দেবদেবীর বিবাহোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়। এই উৎসবকে 'পুংসবন' বলে। অম্বুবাচী ও পুংসবনকালে ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণ বিধিমত মায়ের পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি করেন। দূরদেশাগত যাত্রীদিগের যাহাতে এই দুই উৎসবকালে কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত না ঘটে অথবা তাঁহারা কোনরূপ দুর্ঘটনায় পতিত না হন, তদ্বিষয়ে স্থানীয় পুলিস প্রহরিগণকে তাঁহাদিগের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য কয়েক দিন যাবৎ বড়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়

উপরিউক্ত উৎসবকাল ব্যতীত প্রতি মাসের সব দিনই কামাখ্যা পাহাড়ে বহু যাত্রীসমাগম হয়। এই পাহাড়ে তেমন জলাশয় নাই।

জলকষ্ট

একারণ গ্রীষ্মকালে এখানকার অধিবাসীদিগকে বাধ্য হইয়া নিরতিশয় ক্লেশভোগ করিতে হয়। অধিকন্তু দূরদেশাগত ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থদর্শনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসাতুর হইয়া পড়িলে তত্রস্থ পাণ্ডাগণ শীতল পানীয় প্রদান-করত তাহাদিগের তৃষ্ণানিবারণ করিতে অনেক সময় অসমর্থ হইয়া পড়েন। কারণ ব্রহ্মপুত্র নদ উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশে দিয়া প্রবাহিত

হইলেও বহুনিম্নে অবস্থিত। এজন্য তথা হইতে জল আনয়ন করা তাঁহাদিগের পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য। পাণ্ডাগণ গ্রীষ্মকালে তীর্থযাত্রীদিগের জলকষ্ট নিবারণার্থ নিম্নস্থ ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে যন্ত্র সাহায্যে কামাখ্যা পাহাড়ে জল তুলিবার জন্য অনেক রাজা, মহারাজা ও ধনশালী ব্যক্তিগণের আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহারা এবিষয়ে সফলমনোরথ হন নাই। কামাখ্যা পাহাড়স্থ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের নিকট একটি ক্ষুদ্র ঝরণা আছে। সেখানে যৎসামান্য সুস্বাদু জল পাওয়া যায়।

৺কামাখ্যার পাণ্ডা

কামরূপে উপযুক্ত শাক্ত ব্রাহ্মণ না থাকায় কোচ বা তথাকথিত শিববংশীয় রাজা নবনারায়ণ কামাখ্যা পাহাড়স্থ বর্ত্তমান কোন কোন পাণ্ডার পূর্ব্বপুরুষকে মিথিলা, কাশী, গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইয়া মায়ের সেবাইত নিযুক্ত করেন। ৺কামাখ্যাধামে সর্ব্বপ্রথম যে কয়জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম অবগত হওয়া সুকঠিন। এখানকার পাণ্ডাগণ বলেন যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জের অধিবাসী ছিলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। তৎপরে রাজা নরনারায়ণ ঐ কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণগণের পাঁচ বংশধরকে কামরূপে সাদরে আনয়নপূর্ব্বক "পাঁচ বড়দেউড়ী" উপাধি দানে সম্মানিত করেন এবং পূজার দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রভূত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। এই পাঁচজন হইতে কামাখ্যা পাহাড়ে সর্ব্বপ্রথম পাঁচঘর ব্রাহ্মণের বসবাস হয়, যথা:— ১। ডেকা বড়দেউড়ী, ২। বুঢ়া বড়দেউড়ী, ৩। হোতা বড়দেউড়ী ৪। বিবিধ পাঠকরাও বড়দেউড়ী ও ৫। ব্রহ্মাও বড়দেউড়ী।

আহোমরাজ রুদ্রসিংহ নদীয়া হইতে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শাক্ত ব্রাহ্মণকে কামরূপে আনয়ন করত তাঁহাকে কামাখ্যাদেবীর প্রধান দেউড়ী (পূজারী)র কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ কামাখ্যা পাহাড়ে বসবাস করিতেছেন। কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের বিধানমতে আজিও ৺কামাখ্যা দেবীর পূজার্চ্চনা হইতেছে। শুনা যায়—স্বর্গগত প্রাচীন পাণ্ডাগণের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর (ডেকা বড়দেউড়া) দেবশর্ম্মা একজন উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন; এবং বিষয়-সম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিকাংশ সময় দেবীর পূজায় রত থাকিতেন। সর্ব্বেশ্বর জীবনের শেষভাগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কামাখ্যার ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কামরূপীয় ও পশুপতির নিবান্ধনুযায়ী করিয়া থাকেন। কামরূপের হিন্দুসমাজে পশুপতির মতও প্রচলিত আছে। এই পশুপতি বল্লাল সেনের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধের অগ্রজ। কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত কামাখ্যাধামের ব্রাহ্মণগণের বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত কলিতা, কোচ, মালাকার প্রভৃতি জাতির লোকও কামাখ্যাদেবীর সেবাইত আছেন।

অতিথিবৎসলতার জন্য কামাখ্যার পাণ্ডাগণ বহুকাল ধরিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। ৺কাশী, ৺গয়া, ৺বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থের পাণ্ডাদিগের ন্যায় এখনও (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) ইহাদিগের পীড়ন নাই। বিগত কয়েক বৎসর হইতে নব্য পাণ্ডাদলের মধ্যে কাহারও কাহারও মতিগতি এবিষয়ে একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাত্রী-সংগ্রহে বেশ দু'পয়সা আছে দেখিয়া তাঁহারা ইহাকে একটী লাভজনক ব্যবসা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ বহুকাল হইতে যাত্রীদিগের উপর নির্ভর করিয়া বংশপরম্পরায় সুখ-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মভীরু, অতিথিবৎসল, সংযমী ও স্বল্পপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে নব্য পাণ্ডা-

দলের মধ্যে কাহারও কাহারও সে সকল গুণ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। বয়োবৃদ্ধ পাণ্ডাগণ অদ্যাবধি তাঁহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণ পিতৃ-পিতামহাদির পন্থা অনেকটা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কামাখ্যাধামের পাণ্ডাদিগের সামাজিক চালচলন ও আচার-ব্যবহার এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, সে গুলির সংবাদ প্রাচীন কামাখ্যাযাত্রী এবং গৌহাটী অঞ্চলের বৃদ্ধ লোকদিগের মুখে শুনিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। গৌহাটীর প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় রামদাস ব্রহ্মের নিকট শুনা গিয়াছে যে, ১২৯০।৯১ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে কামাখ্যায় স্ত্রীস্বাধীনতা (৬) ছিল। ভূমিকম্পে কামাখ্যা পাহাড়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয় বলিয়া তথাকার স্বচ্ছল অধিবাসিগণ কাষ্টনির্ম্মিত গৃহে বসবাস করিয়া থাকেন। বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের দোকান-পাট, ব্যবসায় কৃষিকার্য্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তৎপরে কয়েকজন সঙ্গতিসম্পন্ন পাণ্ডা পর্ব্বতের নিম্নভাগে ভূমিক্রয় করিয়া চাষ-আবাদ করিতে আরম্ভ করেন।

কামাখ্যা পাহাড় কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডাগণের নিষ্কর সম্পত্তি। এখানকার পাণ্ডাদিগের মধ্য হইতে ৺কামাখ্যা দেবীর পূজারী দলাধ্যক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হন। আমরা শুনিয়াছি, পাণ্ডাদিগের যে পঞ্চাইত সভা আছে, ঐ সভার সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে ৺কামাখ্যা দেবীর সেবাদি চালাইবার জন্য গৌহাটীর কমিশনর সাহেবকে প্রতি বৎসর উক্ত সভার সভ্যগণকে ডাকাইয়া সেবাইত নিযুক্ত করিতে হয় বর্ত্তমান বৎসরে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) ৺কামাখ্যাধামে অন্যূন ১৫০ ঘর পাণ্ডা বসবাস করিতেছেন।

(৬) গৌহাটীস্থ উজান বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "কেবল কামাখ্যা পাহাড়ে কেন, নগরে ব্যতীত আসামের পল্লীগ্রাম সমূহে অদ্যাবধি স্ত্রীস্বাধীনতা আছে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভুবনেশ্বরীর মন্দির—ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটী ঠিক কামাখ্যা পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা এই চূড়াকে ভুবনেশ্বরের পাহাড় বলেন। শুনা যায়, ভুবনেশ্বর পাহাড় হইতে পুরাণ-প্রসিদ্ধ উষানগরী (বর্ত্তমান তেজপুর) পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। এখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের শোভা অনির্ব্বচনীয়! কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ। এই মন্দিরের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা আছে; তাহা হইতে সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। কালিকা পুরাণে ভুবনেশ্বরীর উল্লেখ আছে:—

মহাগৌরী তু যা দেবী যোগিনী সিদ্ধরূপিণী।
সা ব্রহ্মপর্ব্বতে চাস্তে শিলারূপেণ চোর্দ্ধতঃ॥
অতীব রূপসম্পন্না নাম্না সা ভুবনেশ্বরী।
যত্র ব্রহ্মা তু সংসক্তো ময়ি পর্ব্বতরূপিণি॥ ২৭

—দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ 'মহাগৌরী নামে সিদ্ধরূপিণী যে যোগিনী আছেন, তিনি ব্রহ্ম পর্ব্বতের উর্দ্ধে শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন; তিনি অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী এবং ভুবনেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। সেখানে পর্ব্বতরূপী আমাতে ব্রহ্মা সংযুক্ত হইয়াছেন। সেই স্থানেই তিনি অবস্থিত।' ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটী ভূমিকম্পে ভূতলশায়ী হওয়ায় দারভাঙ্গার মহারাজা আপন ব্যয়ে ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

কালীপুর আশ্রম—শ্রীমৎপূর্ণানন্দ স্বামী বিগত ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কামাখ্যা পাহাড়ের অদূরে পূর্ব্বদিকে একটী উচ্চ

শৈলোপরি এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানার এলাকাধীন জগৎপুর আশ্রমের (৭) শাখাশ্রম। স্বামীজির আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায়। ইনি হিমালয়স্থ কাঞ্চনজঙ্ঘার উপত্যকা ভূমিতে—১৯ হাজার ফিট উর্দ্ধে—৫ বৎসর সিদ্ধাশ্রমে ছিলেন। সেখান হইতে অবতরণ করিয়া ৪ বৎসর কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে ১৭ বৎসরকাল ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও শ্মশানে অবস্থানান্তর ৩০ বৎসরকাল জগৎপুর আশ্রমে আছেন। উক্ত ১৭ বৎসরের মধ্যে তিনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত দারোরা নামক স্থানস্থ শ্মশানে ৯ বৎসর এবং বরিশাল জেলার অন্তর্গত সমুদয়কাটী নামক স্থানের শ্মশানে ৬ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিগত ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে আমরা কালীপুর আশ্রম দেখিয়াছি। এই আশ্রমের জায়গা-জমি প্রায় ৩০ বিঘা। তৎকালে দশ জন কুমারী ও দুইজন বিধবা সেখানকার ছাত্রী ছিলেন। স্বামীজি আমাদিগকে বলিয়া ছিলেন, "এখানকার মেয়েদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ষড়্‌দর্শন অধ্যয়ন করিতে হয়। লবণ, ঝাল ও অম্ল খাইবার নিয়ম ইহাদিগের নাই। বিগত ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) তারিখে আমাদের পত্রোত্তরে তিনি কালীপুর আশ্রম হইতে লিখিয়াছিলেন, "আমরা জল-আচরণীয় জাতির বিধবা কন্যাকেই আশ্রমে গ্রহণপূর্ব্বক উপনিষদের প্রণালীতে সাধনোপদেশ ও ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিয়া থাকি।" স্বামীজি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও সাধক। সুতরাং তৎপ্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম যে একটী পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

---

(৭) জগৎপুর আশ্রম—এই আশ্রম হইতে বাসন্তী, যোগেশ্বরী, সরলা প্রভৃতি মেয়েরা সাংখ্য, বেদান্ত ও ষড়্‌দর্শন পাঠ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

হয়গ্রীব মাধব—আমীন গাঁওয়ের ঠিক পশ্চিম দিকে প্রায় ১৩ মাইল দূরে বরলিয়া নদীর পূর্ব্ব তীরে "হাজু" নামে একটি বহু প্রাচীন পল্লী আছে। ঐ পল্লীর নামানুসারে হাজু পরগনা নামকরণ হইয়াছে। এই স্থানটী সমতল হইলেও মধ্যে মধ্যে অনুচ্চ পাহাড় আছে। এতাদৃশ একটী পাহাড়ের উপর "হয়গ্রীব মাধব"এর মন্দির বিরাজমান। পাহাড়টী 'মণি পর্ব্বত' নামে আখ্যাত। উহা প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ। কোচরাজ বিশ্বসিংহের পৌত্র রাজা রঘুদেব (শুক্লধ্বজের পুত্র) কর্তৃক ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মাধব (গদাধর) দেবতার প্রীত্যর্থে কোচরাজের আদেশে ৭০০ শত নরবলি প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রবল ভূমিকম্পে হয়গ্রীব মাধবের বিখ্যাত দেবালয়টী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে মনিকূট পর্ব্বত ও তথায় ভগবান হয়গ্রীবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"বর্ণাশায়া দক্ষিণস্যাং লৌহিত্যো নাম সরঃ।
মণিকূটঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে হয়গ্রীবো হরির্যত ॥"

অর্থাৎ বর্ণশায়ার দক্ষিণে লোহিত্য নামক সাগর। তাহার পূর্ব্বে মণিকূট নামক পর্ব্বত ; সেখানে হরি হয়গ্রীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরাণের ৭৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "ভস্মকূটস্য চৈশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ" অর্থাৎ ভস্মকূটের ঈশান কোণে মণিকূট নামে একটী পর্ব্বত আছে।

হাজোস্থ দেবালয়ের কৃষ্ণপ্রস্তরময় বিগ্রহটী দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, এখানে এক সময়ে বৌদ্ধদিগের আশ্রম ছিল। কারণ উক্ত বিগ্রহটী বুদ্ধদেবের ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি বিশেষ। ইহার উচ্চতা ১॥ ফিট। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে মহামুনি বলিয়া থাকেন। এক্ষণে এইস্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের তীর্থরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। প্রতি

বৎসর এখানে দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র হিন্দুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তিব্বত ও নেপাল দেশীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিও তীর্থযাত্রীরূপে আসিয়া হয়গ্রীব মাধবের পূজা দিয়া থাকেন। এমন কি, প্রতি বৎসর ধর্ম্মপ্রাণ চীন ও মঙ্গোলীয়ার বহু লোক শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য এবং হিমালয়ের বরফরাশি অতিক্রমপূর্ব্বক "হয়গ্রীব মাধব" দর্শন করিয়া যান।

পোয়ামক্কা—কামরূপের অন্তর্গত হাজোস্থ পোয়ামক্কায় মুসলমানদিগের যে পরম পবিত্র মসজিদ আছে, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাদশাহী আমলের পীরোত্তর ভূমি আছে। মক্কা হইতে মৃত্তিকা আনিয়া উক্ত মসজিদের মেজ পূর্ণ করা হইয়াছিল বলিয়া এই মসজিদ "পোয়ামক্কা" নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে ধর্ম্মাত্মা গিয়াসউদ্দিনের সমাধি আছে। গিয়াসউদ্দিন মোগল পক্ষে আহোমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ নামক স্থানে হত হইলে তাঁহার শবদেহ হাজোতে আনীত ও সমাহিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের Calcutta Review নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ, "গিয়াসউদ্দিন ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে হোসেন সাহের পুত্র দানিয়াল সাহের পরবর্ত্তী হাজোর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি হাজোতে পোয়ামক্কা নামে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ ব্যতীত একটী মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেন। গিয়াসুদ্দিন তথায় ধর্ম্মার্থে ভূমিদান করিয়াছিলেন।" কামরূপের মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, "পোয়ামক্কা তীর্থদর্শনে মক্কা গমনের এক পোয়া ফললাভ হইয়া থাকে।"

চৈতন্য ঘোপা—হাজো পরগণাস্থ মণি পর্ব্বতের পাদদেশে যে গহ্বর আছে, স্থানীয় লোকেরা তাহাকে "চৈতন্য ঘোপা" বা "চৈতন্য গোঁফা" বলেন। এইরূপ জনপ্রবাদ—শ্রীচৈতন্য নামে জনৈক সন্ন্যাসী এই

গহ্বরে একসময়ে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। গৌহাটীর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহোদয়ের ধারণা "ইনিই নদীয়ার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য শ্রীশঙ্করদেবের অন্যতম ভক্ত মহাপুরুষ শ্রীদামোদর দেবের জীবনীতে সবিশেষ প্রকাশ করিব। চৈতন্য ঘোপার নিকট "বরাহকুণ্ড" অবস্থিত।

অশ্বক্রান্তগয়া—গৌহাটীস্থ শুক্লেশ্বর ঘাট হইতে ষ্টিমারে ও নৌকায় অশ্বক্রান্তগয়ায় যাওয়া যায়। কথিত আছে—যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মক-দুহিতা 'রুক্মিণী'কে হরণপূর্ব্বক গৃহে যাইবার কালে তাঁহার রথাশ্ব উত্তর গৌহাটীস্থ ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে সম্মুখস্থ শৈলে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় ঐ স্থান "অশ্বক্রান্তগয়া" নামে অভিহিত হইয়াছে। অশ্বক্রান্তগয়ার একস্থানে ঐ অশ্বের (!) ক্ষুরচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আসাম বুরঞ্জী পাঠে অবগত হওয়া যায়, "আহোমরাজ সুতান ফা ১৭২১ খ্রীঃ অব্দে অশ্বক্রান্তগয়ায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন ও কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশয্যা মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল।" অশ্বক্রান্তগয়ায় অনেকে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

যোগিনীতন্ত্রে অশ্বক্রান্ততীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে :—

অশ্বক্রান্তে পরো যোগঃ অশ্বক্রান্তে পরা গতিঃ।
অশ্বক্রান্তে পরো মোক্ষস্তীর্থং নৈবাস্তি তাদৃশম্ ॥ ৩৯
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গয়াদ্বারে চ পুষ্করে।
যা গতির্ব্বিহিতা পুংসাং অশ্বক্রান্তনিবাসিনাং ॥ ৪২
ন দানৈন´ তপোভিন´ যজ্ঞৈন´াপি চ বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা অশ্বতীর্থে যা লভ্যতে ॥ ৪৩

অর্থাৎ অশ্বক্রান্তে পরম গতি, পরম যোগ ও পরম মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ইহার মত তীর্থ আর নাই। অশ্বক্রান্তবাসীর যে গতি, কুরুক্ষেত্র, গয়া

ও পুষ্করবাসীদিগেরও তাহা হয় না—অর্থাৎ অশ্বতীর্থে (অশ্বক্রান্তগয়ায়) তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

অশ্বক্রান্তার শিলালিপি—

স্বস্তি শ্রীশ্রীসুরগন্ধর্ব্ববৃন্দবন্দিতগীত-নৃত্য-বাদ্যমঙ্গল-প্রত্যুৎসুকমায়ামর্দ্দন-জনার্দ্দনদেবদোলান্দোলনবিনোদবিলাসায় মহারাজ শ্রীশ্রীশিবসিংহনৃপাজ্ঞয়া জনার্দ্দনপদপঙ্কজপরায়ণ শ্রীমদনুজদুবরাবৃহৎফুকনেন জনার্দ্দনগিরৌ ফল্গূৎসবদোলমঞ্চমকারি ত্রিনয়নাব্ধিতর্কশশভৃচ্ছকে ১৬৭৩।

অনুবাদ—

মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহের আদেশে জনার্দ্দনদেবের পাদপদ্ম-পরায়ণ শ্রীযুক্ত অনুজ দুবরা বৃহৎ ফুকন দেবগন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক বন্দিত, গীত নৃত্য বাদ্য মঙ্গল ধ্বনিতে প্রীতিযুক্ত মায়ামর্দ্দন জনার্দ্দনদেবের দোলান্দলনে বিনোদবিলাসার্থ জনার্দ্দন পর্ব্বতে ফল্গূৎসবের নিমিত্ত ১৬৭৩ শকে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

উমানন্দ—অশ্বক্রান্তগয়া হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী পাহাড়ের উপরিভাগে "উমানন্দ দেব"এর মন্দির। এই দেবের নামানুসারে পাহাড়টী "উমানন্দ পাহাড়" নামে আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গৌহাটীস্থ শুক্লেশ্বর ঘাট হইতে নৌকাযোগে ৩০।৩৫ মিনিটে সেখানে যাওয়া যায়। সেখানকার পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকেন, "এই পাষাণময় দ্বীপটীর নাম "ভস্মাচল"। এই স্থানে হরকোপানলে কামদেব (Cupid) ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে এখানকার এই উমানন্দ 'বৃষধ্বজ' নামে অভিহিত হইতেন। ইনি ললাটস্থ ভস্মের দ্বারা এখানে এই পাহাড়টী নির্ম্মাণ করিয়া পার্ব্বতীকে গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণশাস্ত্রে 'ধর্ম্মমার্গ' ও তন্ত্রশাস্ত্রে 'বৃষধ্বজ' নামে আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'বৃষধ্বজ' ৺কামাখ্যার ভৈরব বলিয়া ইঁহাকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিয়া ৺কামাখ্য'দর্শন বিধেয় বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে।" পাঠক!

৺উমানন্দ দেবের পাণ্ডার এই উক্তি কোন্ পুরাণ ও তন্ত্র-সঙ্গত এবং সেগুলি কোন্ সময়ে কি কারণে বিরচিত হইয়াছিল, আমরা তাহা অনুসন্ধান করি নাই। একারণ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ভস্মাচলস্থ ঐ গহ্বরের সম্মুখে নিম্নোদ্ধৃত দ্বিচরণ বিশিষ্ট হেঁয়ালী শ্লোক দৃষ্ট হয়। আমরা ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।—

"শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগ্যং শিবাত্মকম্।
শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে॥ ১
দেবদেবীস্তুতস্তোঽয়ং শিবগৌরী সদাস্তু.নঃ।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সানুস্থিতিং প্রতি॥" ২

উমানন্দ পাহাড়ে দুইটী মন্দির বিরাজিত। একটীতে ভগবান্ উমানন্দ (শিব) দেবের মন্দির এবং অপরটীতে রুদ্রদেবের নাটমন্দির স্থাপিত। আহোমরাজ গদাধর সিংহ ১৬১৬ শকে এই উমানন্দ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অতঃপর ১৬৪১ শকে রাজা শিবসিংহ এই দেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া ইঁহার সেবা-পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পূর্ব্বে এখানে বহুসংখ্যক নরবলী হইত। ইংরাজের সুশাসনগুণে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। শিবরাত্রির সময় এখানে যেরূপ যাত্রিসমাগম হয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। উমানন্দ পাহাড়ে ঝরণা নাই। এই পাহাড়ের নিম্নভাগে ব্রহ্মপুত্রের তটদেশে একটী গুহা আছে। উহাতে তিন চারিজন লোক থাকিতে পারে। কথিত আছে, "ঐ গুহায় কোন মুনি তপস্যা করিতেন।" এক্ষণে কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে অস্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থান করিতে দেখা যায়। উমানন্দ পাহাড়ে দোকান অথবা তেমন কোন প্রকার চাষ-আবাদ না থাকায় যে কয়েক ঘর পাণ্ডা বসবাস করেন, তাঁহাদিগকে গৌহাটী হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়।

প্রতি বৎসর শিবরাত্রিকালে এই দেবের উদ্দেশ্যে অন্যূন ৩০।৩৫টী খাসী-ছাগের দেহ হইতে নৃশংসভাবে প্রাণ বিয়োগ করিয়া দেওয়া হয়।

দেব-প্রীতি না অভি-সম্পাত-প্রাপ্তি ?

পাঠক ! সে লোমহর্ষণ কাণ্ড শুনিবেন কি ? শিবরাত্রিকালে যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া এখানে তাহাদিগের শিরশ্ছেদ করা হয় না। কয়েকজন নির্ম্মম ষণ্ডা ব্যক্তি মিলিয়া ক্রমাগত কিল, চড় ও ঘুসি মারিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলে। আহোমরাজ শিবসিংহের আমোল হইতে এই প্রথা নাকি চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারই আদেশে এইরূপ নির্ম্মমভাবে ছাগ (খাসী) হত্যার আদেশ হইয়াছিল বলিয়া এখানকার পাণ্ডা মহাশয়েরা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নহেন। এখন কথা হইতেছে—আহোমরাজ শিবসিংহ কাহার পরামর্শে এই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ? নদীয়ার রাণাঘাটের সমীপবর্ত্তী মালিপোতা গ্রামের কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এইরূপ করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হইবে।" শিবরাত্রে উমানন্দ দেবের নিকট মৎস্য ও মাংসের ভোগ বিধান কোন্ তন্ত্রসঙ্গত, আমরা তাহা অবগত নহি। এখানকার পাণ্ডা মহাশয়গণের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে কিরূপ বিসদৃশ কাজ করিতেছেন। কামরূপ জেলার টীহু পোষ্ট অফিসের এলাকাধীন হেলঞ্চা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত পুষ্পচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমানে (১৯২০ সাল) ৺উমানন্দ দেবের প্রধান পাণ্ডা।

কর্ম্মনাশা—উমানন্দ দেবের মন্দিরের পশ্চাৎদিকে 'কর্ম্মনাশা' নামে একটী শৈলশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন, "যদ্যপি কেহ ঐ শৈলশৃঙ্গ দেখিতে পান, তাহা হইলে ঐ দর্শনকারীর এখানকার যাবতীয় তীর্থফল নিষ্ফল হয়।"

উর্ব্বশীকুণ্ড—উমানন্দগিরি হইতে পূর্ব্বদিকে অল্পদূরে ব্রহ্মপুত্র

বক্ষে "উর্ব্বশীকুণ্ড" অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা উহাকে উর্ব্বশীতীর্থ বলিয়া থাকেন। পাণ্ডাগণ এই কুণ্ডটী একটী স্ত্রীমূর্ত্তির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ষায় এখানকার শৈলাগ্রভূমিও ডুবিয়া যায়। উহাতে ষ্টীমারের তলদেশ ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ঐ শৈলোপরি একটী প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ছত্রাকার মন্দির—গৌহাটী হইতে অল্পদূরে নবগ্রহ (চিত্রাচল) পাহাড়ের সন্নিকটে "ছত্রাকার" নামে একটী শৈল আছে। তথায় ছত্রাকার এবং মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান। ছত্রাকার শৈলটী বড়ই মনোরম। এই শৈলোপরি আহোমরাজ কমলেশ্বর সিংহের মন্ত্রী "কলিয়া ভ্রমরা"র আদেশে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ আশ্রম—গৌহাটী হইতে ৭ মাইল দূরে বেলতলা নামক স্থানের নিকটস্থ একটী গভীর অরণ্যমধ্যে এই জনপ্রসিদ্ধ আশ্রমটী অবস্থিত। পূর্ব্বে বশিষ্ঠ আশ্রম বেলতলা মৌজার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে উহা খাসমহলের সীমাভুক্ত হইয়াছে। এই স্থানটী নির্জ্জনতার রাজত্বভূমি—ঋষিগণের সাধনার প্রকৃষ্ট স্থান। চারিদিকে পর্ব্বত, শাল, তমালাদি বনে স্থানটীর নির্জ্জনতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। এখানে সূর্য্যবংশীয় রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠদেব যোগ আরাধনা করিতেন বলিয়া ইহার নাম বশিষ্ঠ আশ্রম হইয়াছে। বশিষ্ঠ কশ্যপের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কর্দ্দম-কন্যা "অরুন্ধতী" ইঁহার ভার্য্যা ছিলেন।

বশিষ্ঠ আশ্রমে দেখিবার প্রধান জিনিস—জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতটী উত্তর দিক্ হইতে বহির্গত হইয়া একস্থানে "সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা" নামে তিনটী স্বতন্ত্র ধারায় ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব যেখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেখানে একটী মন্দির আছে। বশিষ্ঠ আশ্রমস্থিত এই মন্দিরের দ্বারদেশে গ্রথিত প্রস্তরফলকস্থ লিপি (Stone inscription) খানি পাঠে

অবগত হওয়া যায়, "আসামের রাজা রাজ্যেশ্বর (প্রমথ সিংহের পরবর্ত্তী) সিংহের আদেশে তাঁহার সেনাপতি দশরথ দ্বারা ১৭৫১ খৃঃ অব্দে বশিষ্ঠ আশ্রমে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।" এই মন্দিরের অপর দিকে সাধারণের থাকিবার জন্য একটী বাসস্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানে রাত্রিবাস করা চলে, কিন্তু খাদ্য-দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। গৌহাটী হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়।

পাণ্ডুনাথ—যোগিনীতন্ত্রে কামাখ্যা তীর্থপ্রসঙ্গে পাণ্ডুনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে কামরূপের "পাণ্ডু" নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরস্থ পাণ্ডুঘাটেই 'পাণ্ডুনাথ' নামক বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত ছিল। এখানকার মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব তদীয় অমাত্য গদাধরের বাক্যে ১৬০৭ শকে এই বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কোচরাজ রঘুদেব ১৫৮১ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপির শকের সহিত তদীয় রাজত্বকালের সামঞ্জস্য নাই। এই মন্দির এক্ষণে অস্তিত্ববিহীন। ভূমিকম্পের ফলে ইহার অস্তিত্ব লোপ হওয়াই সম্ভব। ঠিক কোন্ স্থানে আদি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি টিনের ঘর বর্ত্তমানে উহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। শ্রীযুক্ত এডোয়ার্ড গেইট তাঁহার সঙ্কলিত আসামের ইতিহাসে এই লিপি সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। নিম্নে পাণ্ডুঘাটের সন্নিকটস্থ টিনের ঘরবিশিষ্ট পাণ্ডুনাথ নামক বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপি উদ্ধৃত করা হইল :—

১। ৺শ্রীমন্মল্লনৃপাত্মজস্য কৃতিনঃ শুক্লধ্বজস্যাত্মজে।

২। বীরে শ্রীরঘুদেবভূপতিকুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ॥

৩। দুর্গাদত্তবরেণ শাসিতগুণগ্রামাভিরামে মহীং।

৪। তস্যামাত্যগদাধরস্য বচসা স্নেহানুকুল্যাদপি ॥

৫। শ্রীপাণ্ডুনাথস্য পুরে নির্ম্মাতি প্রসাদস্য নির্ম্মিতবান মনোজ্ঞং।

৬। পয়োনিধিবিষ্ণুপদেকতানঃ শাকে দ্বীপব্যোমরসেন্দুসংখ্যে ॥

স্বর্গীয় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তাঁহার আসাম-বুরঞ্জীর একস্থানে লিখিয়াছেন—"লৌহিত্যৰ দক্ষিণ তীৰে নীলাচল পর্ব্বতৰ বায়ুকোণে পাণ্ডুনাথ নামে এক দেৱালয় আছে। তাত পাণ্ডৱসকলে প্রতিষ্ঠা কৰা দেবমূর্ত্তি আছে বুলি কোনো কোনো পুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্র কয়। আৰু সেইরূপ প্রবাদ আজিলৈকে চলি আহিছে।"

গরিখা গোসাই—কামরূপের বড়নগর পরগণার অন্তর্গত দমকা-চকাবাউসীর মধ্যে উত্তর গণকগারী গ্রামে "৺গরিখা গোসাই" এর একটী বহু প্রাচীন দেবালয় আছে। বিগ্রহটী কাষ্ঠময়। বড়নগর অঞ্চলের কোচেরা গরিখা গোসাইকে তাঁহাদের কুলদেবতা বলিয়া থাকেন। কোচ ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোকেরা এই বিগ্রহের পূজা করিবার অধিকার নাই। ইঁহার নিকট কোন বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। প্রতি বৎসর গরিখা গোসাইয়ের উৎসবোপলক্ষে গণকগারী গ্রামে ৪।৫ দিন মেলা হয়। এই মেলায় অন্যূন ৭ হাজার লোকসমাগম হয়। গরিখা গোসাই কোচদিগের জাতীয় দেবতা হইলেও স্থানীয় সকল শ্রেণীর লোকদিগকে ইঁহার প্রসাদ অতীব ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিতে আমরা দেখিয়াছি। দমকা-চকাবাউসীর মৌজাদার রায় সাহেব রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে শুনা গিয়াছে, "বরনগরে সময় সময় মহামারীর ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তৎকালে স্থানীয় লোকেরা ৺গরিখা গোসাইয়ের নিকট হোম ও নগর সংকীর্ত্তন করিলে কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এই বিগ্রহের অনুগ্রহে গণকগারী গ্রামের অধিবাসিগণ এখনও (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) এই ব্যাধির কবলে পতিত হন নাই।" সরভোগ ষ্টেশন হইতে গরিখা দেবালয় প্রায় ২০ মিনিটের পথ।

প্রাচীন দেবতাস্থান

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকট হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই কামরূপ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের তটদেশে হিন্দুদিগের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্র ছিল। কালক্রমে সে সকল বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের এ উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। জনাকীর্ণ নগরীতে ও প্রসিদ্ধ পল্লীসমীপবর্ত্তী নদীকূলে সাধারণতঃ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। পার্ব্বত্য অঞ্চলের যে সকল স্থান স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, সেখানেও আমরা দেবালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। আহোমরাজ রুদ্রসিংহ বহুসংখ্যক প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধানের পর গৌহাটী সীমানার অন্তর্গত দেবালয়গুলির স্থান নির্ণয়ার্থ ১৬৩৪ শকে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে উহাদের নামোল্লেখ করা হইল :—

১। মণিকূট ; ২। মদনাচল ; ৩। গোকর্ণ ; ৪। গরুড়াচল ; ৫। কুবেরাচল ; ৬। মকরেশ্বর ; ৭। ব্রহ্মাবৈ ; ৮। আলাবৈ ; ৯। অগ্নি ; এই পাহাড় কয়টী কামরূপ জেলার হাজো অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমাদের মনে হয়। ১০। চিলার পর্ব্বত ; ১১। কালজোরক ; ১২। কটা পাহাড় ; ১৩। খরা গরুয়ার ; ১৪। নক্ষত্রাচল (কটা পাহাড়ের পূর্ব্বে), ১৫। নক্ষত্রাচলের চারিদিকে চারিটি পর্ব্বত—উহারাও নক্ষত্রাচল নামে অভিহিত ; ১৬…১৭…১৮…(৮)। ১৮। গিরিকাচল ; ২০। নাটকাচল ; ২১। ছত্রাচল ; ২২। নীলখাতক ; ২৩। দীর্ঘেশ্বরী (উত্তর গৌহাটীতে) ; ২৪। মানসাচল ; ২৫। মানসাচলের পূর্ব্বে যে ৭টী পর্ব্বত আছে তাহারা সপ্তর্ষি পর্ব্বত নামে অভিহিত ; ২৬। সপ্তর্ষি পর্ব্বতের দক্ষিণে কুবেরাচল নামে একটী ছোট পর্ব্বত ; ২৭। ক্রৌঞ্চপর্ব্বত, ২৮। দশাশ্বমেধ পর্ব্বত,

---

(৮) নামগুলি অবুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় (…) এই চিহ্ন দেওয়া হইল।

২৯। মণিকর্ণেশ্বর, ৩০। আমুণি (আমীনগাঁওয়ের নিকট), ৩১। এমুণি; ৩২···৩৩·৩৪। গিরিকাচল নামক তিনটী পর্ব্বত—সেখানে গদাধর মাধব প্রতিষ্ঠিত; ৩৫···৩৬। জগন্নাথ পর্ব্বত—সেখানে নারদের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত; ৩৭। চন্দ্রপর্ব্বত—সেখানে মাধব ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত; ৩৮। ইন্দ্র পর্ব্বত—ইহা ব্রহ্মপুত্র নদ মধ্যে, এখানে সহস্রাক্ষ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত; ৩৯। চন্দ্রপর্ব্বতের দক্ষিণে অশ্ব পর্ব্বত—সেখানে জনার্দ্দন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; ৪০। জনার্দ্দন পর্ব্বতের দক্ষিণে অশ্বক্রান্ত গয়া; ৪১। অশ্বপর্ব্বতের বায়ুকোণে যে চারিটী পর্ব্বত আছে তাহাদের নাম "গোদণ্ড"; ৪২। গোদণ্ড হইতে তিনটী পর্ব্বতের পরে সীতা-কুণ্ডের নিকট জটাধর মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; অশ্বক্রান্ত ও সীতা-কুণ্ডের মধ্যে যে নির্ঝর আছে তাহার নাম 'সন্তানধরা'—সেখানে স্নান করিলে নিঃসন্তানের সন্তান হয়; ৪৩। গোদণ্ড পর্ব্বতের নিকট বায়ু পর্ব্বত; এই পর্ব্বতের তিনটী শৃঙ্গের নাম লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বিষ্ণু। ৪৪। শরাইঘাটের নিকট লৌহিতেশ্বর পর্ব্বত; ৪৪···৪৮। লৌহিতেশ্বর পর্ব্বতের ঈশান কোণে পাঁচটী পর্ব্বত, অসমীয়ারা ইহাকে "লঠীয়া পর্ব্বত" বলেন। এই পর্ব্বতের পাঁচটী শৃঙ্গের নাম—ভস্মকূট, কালকূট, ক্ষেমকূট, দন্তকূট ও শোককূট; ৪৯। দন্তকূট পর্ব্বত; ৫০। দন্তকূটের পূর্ব্বে মদন পর্ব্বত; ৫১। মদন পর্ব্বতের দক্ষিণে গিরিকাচল; ৫২। গিরিকাচলের উত্তরে দুইটী পর্ব্বত আছে, নাম—কুণ্ডক; সেখানে কার্ত্তিক আছেন; ৫৩। হাতিমুরা পর্ব্বতে ধারেশ্বর ও পিঙ্গলেশ্বর নামক দুইটী বিগ্রহ আছেন; হাতিমুরার উত্তরে কামধেনু পর্ব্বত; ৫৫। কামধেনুর উত্তরে গণেশ পর্ব্বত; ৫৬। গণেশ পর্ব্বতের উত্তরে ভরদ্বাজ পর্ব্বত; ৫৭। গন্ধমাদন পর্ব্বত; উহার অগ্নিকোণে ভৃঙ্গেশ্বর মূর্ত্তি আছে। গন্ধমাদনের পূর্ব্বশৃঙ্গের পাদদেশে নৃত্যশীলা, তাহার দক্ষিণে "অন্তরাণি কুণ্ড"। ৫৮। অন্তরাণি কুণ্ডের অগ্নিকোণে তিনটি

শৃঙ্গযুক্ত "লাংকুশ" নামে একটি পর্ব্বত আছে। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "রাবণবই" পর্ব্বত বলে। ৫৯। বরাহ পর্ব্বত; ৬০। মৎস্য পর্ব্বত; ৬১। অনন্ত পর্ব্বত—ইহার সাতটি শৃঙ্গ; ৬২। রাক্ষস পর্ব্বত—যেখানে মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। ৬৩। বাঘেশ্বরী পর্ব্বত—এই পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ, যথা—সিদ্ধেশ্বর, বাঘেশ্বর ও রত্নেশ্বর। বাঘেশ্বরী পর্ব্বত উত্তর গৌহাটিতে অবস্থিত। ৬৪। গোবিন্দ পর্ব্বত; ইহার দুইটি শৃঙ্গ—গোবর্দ্ধন ও জ্ঞান। ৬৫। দুর্গা পর্ব্বত; ৬৬। গজসার্দ্ধয় পর্ব্বত; ৬৭। মধ্যাহ্নক; ৬৮। চিরঞ্জীব পর্ব্বত; ৬৯। কপিলি এবং নামধেনু পর্ব্বত; ৭০। নমনঙ্গ পর্ব্বত।

কোন্ কোন্ রাজা কত শকে কোন্ কোন্ বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উল্লেখ (৯) করা হইল:—

রাজার নাম		বিগ্রহের নাম	সংস্থাপন কাল
কোচবংশীয়	শুক্লধ্বজ	৺কামাখ্যা	১৪৮৭ শকাব্দ
,,	রঘুদেব	হয়গ্রীব মাধব	১৫০৫ ,,
আহোমবংশীয়	শিবসিংহ	উমানন্দ	১৬১৬ ,,
,,	ঐ	অশ্বক্রান্ত	১৬৪২ ,,
,,	ঐ	উগ্রতারা	১৬৪৭ ,,
,,	প্রমথ সিংহ	কামাখ্যা (শিলঘাটস্থ)	১৬৬৭ ,,
,,	ঐ	শুক্রেশ্বর ও জনার্দ্দন	১৬৬৬ ,,
,,	রাজেশ্বর	রুদ্রেশ্বর	১৬৭৩ ,,
,,	ঐ	নবগ্রহ	১৬[illegible]৫ ,,
,,	ঐ	বশিষ্ঠ আশ্রম	১৬৮৬ ,,

(৯) দেবালয়ের গাত্রে সুরক্ষিত প্রস্তরফলক হইতে আমরা কয়েকটী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল প্রাপ্ত হইয়াছি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোচবংশীয় নৃপতি 'রঘুদেব' হয়গ্রীব মাধবের মন্দির সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আসাম প্রদেশস্থ অধিকাংশ দেবালয়ের জন্য রাজপ্রদত্ত ভূসম্পত্তি আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নে আধুনিক কামরূপ জেলাস্থ মাত্র কয়েকটী দেবালয়ের ভূ-সম্পত্তির উল্লেখ করিলাম :—

দেবালয়	লাখেরাজ	নিস্পিখেরাজ
হয়গ্রীব মাধব	৩৮০৯৮ বিঘা	১৬২৯৯ বিঘা
কামাখ্যা	২৩৬৯৮ ,,	× ,,
উমানন্দ	৯৪৩২ ,,	৬০১৩ ,,
ছত্রাকার	২২৮৮ ,,	৪৯৬৩ ,,
বিল্লেশ্বর	১৪১০ ,,	২৮০১ ,,
ধারেশ্বর	১১৭৭ ,,	× ,,
অশ্বক্রান্তগয়া	১১৪১ ,,	৪২৩০ ,,
পাণ্ডুনাথ	৬৯০ ,,	৭৮৯ ,,
চণ্ডিকা (চন্দিকা)	২২১ ,,	× ,,
নবগ্রহ (চিত্রাচল)	২১০ ,,	× ,,
বশিষ্ঠ	১৯৩ ,,	৬৬৪ ,,
পোয়ামক্কা	৯ ,,	৩৮৪৮ ,,

উপসংহার

এখন দেখা যাউক, কোন্ তন্ত্র ও পুরাণ (১০) শাস্ত্রে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক সতীর অঙ্গচ্ছেদের উল্লেখ আছে। তন্ত্রচূড়ামণিতে শিব-পার্ব্বতী সংবাদে

(১০) পুরাণ—এই পুস্তকের ৮ম পৃষ্ঠায় যোনীপীঠ স্থাপন ও সতীর দেহত্যাগ প্রসঙ্গে "একখানি উপপুরাণ"এর নাম করা হইয়াছে। কিন্তু ভ্রমবশতঃ উহার নামোল্লেখ করা না হওয়ায় এবং প্রথম ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়া যাওয়ায় এখানে তাহা বিবৃত করা হইল

সতীর অঙ্গশ্ছেদ

এক পঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে পীঠ নির্ণয় এবং কালিপুরাণে (১৮।৫০।৬১) বিষ্ণু-কর্ত্তৃক সতীর অঙ্গশ্ছেদের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু দেবী ভাগবতের ত্রিংশ অধ্যায়ে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক ধনুর্ধারণপূর্ব্বক তীর দিয়া সতীর অঙ্গশ্ছেদ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

অপশ্যত্তাং সতীং বহ্নে দহ্যমানাস্ত চিৎকলাম্।
স্কন্ধেঽপ্যারোপয়ায়াস হা সতীতি বদন মুহুঃ।
বভ্রাম ভ্রান্তচিত্তঃ সন্নানাদেশেষু শঙ্করঃ॥ ৪৪
তদা ব্রহ্মদয়ো দেবাশ্চিন্তামাপুরনুত্তমাম্।
বিষ্ণুস্ত ত্বরয়া তত্র ধনুরুদ্যম্য মার্গনৈঃ॥ ৪৫
চিচ্ছেদারয়বান্ সত্যাস্তত্তৎস্থানেষু তেঽপতন্॥
তত্তৎ স্থানেষু তত্রাসীন্নানামূর্ত্তিধরোহরঃ।—৭ম স্কন্ধ।

অর্থাৎ—অনন্তর (শিব) দেখিতে পাইলেন যে, সেই চৈতন্যরূপিনী সতীর দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। তখন তিনি হা সতি! হা সতি! বলিয়া রোদন করিতে করিতে সতীদেহ স্বীয় স্কন্ধদেশে আরোপিত করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৪৪। তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ধনুর্ধারণপূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা সতীর অবয়ব সকল ছেদন করিলেন। সেই অবয়ব সকল যে যে স্থানে পতিত হইল, শঙ্কর নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

বিভিন্নরূপে সতীর দেহত্যাগের কথা বিভিন্ন পুরাণকার বলিয়াছেন। পাঠক! এই সকল শুনিয়া আপনাদের কি মনে হয়? আপনাদের অধিকাংশই বলিবেন, "সতীর দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত পুরাণকারগণের কল্পনা-প্রসূত। কোন উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা নিজ নিজ মতানুযায়ী এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।" যাঁহাদের অনুমানের ভিত্তি এইরূপ—তাঁহারা

পুরাণকারগণের নিগূঢ় অর্থ অবগত নহেন। কোন পুরাণকারের উক্তি কল্পিত ও ভিত্তিহীন নহে। আমরা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে এবিষয়ে সবিশেষ বলিব।

বিংশতি পৃষ্ঠায় কোচরাজবংশধরগণের ৺কামাখ্যাদেবী দর্শনে নিষেধ সম্বন্ধে যে বিবরণটী আছে, তাহা বোধ হয় পুরোহিত ঠাকুরের মহিমা প্রকাশ করা অভিপ্রায়ে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে কোনরূপ সত্য নিহিত নাই বলিয়া বিশ্বাস করিবার অনেকগুলি কারণও আছে।

বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের প্রভাবে পরবর্ত্তীকালের কয়েকজন আহোম নৃপতি শাক্তধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া বহু দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

কামরূপে তন্ত্রের প্রভাব

এই দেশের তান্ত্রিকগণের কামরূপে আমদানি হইবার বহুকাল পূর্ব্বে সেখানে যে তান্ত্রিকধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চরিত পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, "Through Kamrupa successive hordes of immegrants from Western China poured into India. From them developed Trantricism of both Buddhism and Hinduism." ইহা যে কোন্ সময়ের কথা, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

আহোমবংশীয় রাজা রুদ্রসিংহ (১৬৯৫-১৭১৪ খৃঃ অব্দ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকার বাহিরে আমরা অনেকগুলি দেবালয়ের নাম পাইয়াছি। তদীয় তালিকায় গৌহাটী সীমানার অন্তর্গত দেবস্থানসমূহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎকালীন গৌহাটী সীমানার আয়তন বহু বিস্তৃত ছিল।

আধুনিক গৌহাটী মহকুমার ধর্ম্মপুর মৌজার অন্তর্গত বিল্লেশ্বর (১১)

(১১) বিল্লেশ্বর দেবালয়=নলবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে বেলসর গ্রামে অবস্থিত। বিগত ১৯২৫ সালের ২রা মার্চ্চ সোমবার তারিখে মাখিবাহা গ্রাম হইতে অসমীয়া কায়স্থ কুলপ্রদীপ বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক মনোহর দেবের বংশধর শ্রীমান্

ও অন্যান্য স্থানের দেবালয় নাম পাওয়া যায় না। ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে বিল্লেশ্বর দেবালয় জীর্ণ হইয়া পড়িলেও সুদৃঢ় গাঁথুনির গুণে আহোমরাজ লক্ষ্মীসিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৭৩ বৎসর অসংস্কৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল।

আধুনিক কামরূপের সকল দেবালয়ের বিষয় উল্লেখ করিতে গেলে পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। পাঠক-পাঠিকাদিগকে এই পুস্তকের অন্য খণ্ডে আসাম প্রদেশের আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবালয় ও আশ্রমের কথা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

মহেন্দ্রনাথ মোহন্তকে ও বেলসর নিবাসী শ্রীমান্ (পণ্ডিত) দণ্ডিরাম দত্তকে লইয়া বিল্লেশ্বর মন্দিরের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়াছিলাম। এই দেবালয়ের প্রভূত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও দলৈ (Manager of a temple) শ্রীযুত দুর্গানাথ দেব শর্ম্মা কতিপয় কলিতা জাতীয় ভদ্রলোকের সহিত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সম্পর্কে এক গণ্ডগোল বাধাইবার পর নিজ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে (?) উহার সাবেক ব্যবস্থার প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হইতেছেন। কোন স্বার্থপর অথবা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে "দলৈ" রাখা কোন রকমে বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণের voteএ যিনি 'দলৈ' পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি নিজ অযোগ্যতা নিবন্ধন ঐ পদ হইতে খারিজ হইতে পারেন। যাহা হউক, আমরা উক্ত দলৈ মহাশয়কে ডাকযোগে পত্র দিয়াছিলাম। তিনি কোন উত্তর দেন নাই।

অসমীয়া হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক কথা

চতুর্থ অধ্যায়

এক্ষণে আমরা আসাম দেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কেওট (১২) দৈবজ্ঞ প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের কয়েকটী পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় সংক্ষেপে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিব। আমাদের এ আলোচ্য বিষয়গুলি আসামে অভিজ্ঞতালব্ধ ও প্রাচীন অসমীয়া ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। বিগত ১০।১১ বৎসরের মধ্যে অসমীয়াদিগের রীতি-নীতি ও চাল-চলনের যেরূপ পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়—অর্দ্ধ শতাব্দী পরে হয়তো এই সকলের কোনরূপ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে না। একারণ আমরা অসমীয়া উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের কয়েকটী পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় বর্ত্তমানে (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১)

ধারা—ইহা বাঁশের সরু সরু চেড়ি দিয়া প্রস্তুত আসন বিশেষ। ধারা দুই প্রকার—"ছাকলি ধারা" ও "চক ধারা"। ছাকলি ধারা-গুলি আয়তনে ছোট ও ইহাদের চারিদিক্ সমান। চক ধারাগুলি গোল। সকল জাতির লোকেরা বাড়ীতে ধারা তৈয়ারী করিয়া থাকেন। তবে অম্বুবাচির কয়দিন এইগুলি বেশী প্রস্তুত হয়। সকল শ্রেণীর

(১২) কেওট—বিগত ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে কামরূপ পর্য্যটনকালে নলবাড়ী নিবাসী মৌজাদার শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী এবং টীহুনিবাসী মৌজাদার শ্রীযুত ঘনকান্ত চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, কামরূপের "বামদিয়া" মৌজার কেওটগণের পূর্ব্বপুরুষেরা আহোমরাজগণের নিকট আধুনিক ডোম জাতির কাজ করিতেন অর্থাৎ পূর্ব্বে তাঁহারা জাউলীয়া কৈবর্ত্ত ছিলেন। একারণ বামদিয়ার কেওটেরা নাকি হাজোস্থ মাধব দেবালয়ে পূজার জন্য কোন সামগ্রী দিতে পারেন না।

অসমীয়ারা ধারায় বসিয়া ভাত খাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া নাম (হরি) সংকীর্ত্তনকালে তাঁহারা উহাতে বসেন এবং বাড়ীতে কোন লোকজন আসিলে তাহাকে বসিতে 'ধারা' দিয়া থাকেন।

জাতি—বিশুদ্ধ কাঁসার এক জাতীয় থালাকে অসমীয়ারা 'জাতি' বা 'জাত কাঁহী' বলিয়া থাকেন। বাড়ীতে কোন নবাগত সম্মানিত ব্যক্তি অথবা জামাতা আসিলে উহাতে করিয়া তাঁহাকে জল-খাবার ও ভাত দেওয়া হয়। 'জাতি' অসমীয়াদিগের নিজস্ব দ্রব্য।

বাণবাটী—অসমীয়ারা বহুকাল হইতে এই বাটী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। আসাম ব্যতীত অন্যত্র ইহার ব্যবহার আমরা দেখি নাই। ইহার গঠন বাঙ্গালা দেশের ধুনাচিরই মত। অসমীয়ারা 'বাণবাটী'তে তরকারী খান এবং জলযোগের জন্য 'বোকা চাউল' ও চিড়া ভিজাইয়া থাকেন।

দগ্‌দগী—ইহা কংসনির্ম্মিত, গাড়ুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। একমাত্র অসমীয়ারাই দগ্‌দগী ব্যবহার করেন। ইহাতে করিয়া তাঁহারা মুখ ধুইবার জল ও পানীয় জল রাখিয়া দেন। দগ্‌দগী হইতে জল লইয়া কোন উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দু পদধৌত করেন না। কেবল দগ্‌দগী নহে—অসমীয়ারা কাঁসার পাত্রকে উত্তম ধাতুমধ্যে গণ্য করায় উহা হইতে জল লইয়া পদধৌত করা তাঁহাদিগের প্রাচীন রীতি বিরুদ্ধ। দগ্‌দগীগুলির গলা লম্বা ও মধ্যস্থান সরু বলিয়া সহজে ইহাদের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার করা যায় না।

বাটা—ইহা কংসনির্ম্মিত। বাটাগুলি কারুকার্য্য সমন্বিত। ছোট, বড়, মাজারি সব রকমের 'বাটা' আমরা দেখিয়াছি। তবে

শরাই ও তেমাবাটা

বাটা অপেক্ষা শরাইগুলি বড় হয়। এই বাটা ব্যবহার আসাম ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে করিয়া সচরাচর পান দেওয়া এবং শ্রাদ্ধ, বিবাহ অথবা পূজা

পার্ব্বণের সময় নৈবিদ্য সাজান হয়। নামের (হরি-সংকীর্ত্তনের) শেষে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে সম্মানার্থ 'বাটা'য় করিয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈবাহিক কার্য্যে নিমন্ত্রিত অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক, সমাজপতি অথবা সত্রাধিকারিগণকে শরাইয়ের উপর বাটা রাখিয়া তাহাতে করিয়া উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুগণ গোটা পান ও আস্ত কাঁচা তাম্বুল (সুপারি) দিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ঐ পান, তাম্বুল বাড়ীতে লইয়া যান। কর্ম্মকর্ত্তার গৃহে তাঁহাদিগকে খাইবার জন্ত পান তাম্বুল দিতে হইলে উপরিউক্ত পাত্র দুইটীর উপর 'তেমাবাটা' দেওয়াই দেশীয় ও জাতীয় চিরন্তন প্রথা। তেমাবাটাগুলির আকার বাঙ্গালা দেশের ডিবার মত। ইহাদের উপরিভাগ ডুমের মত সূচাল।

[২]

সাবেক প্রথা—বাঙ্গালা দেশ হইতে যাহারা দিন কতকের জন্ত কোন প্রয়োজনবশতঃ অথবা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে আসামে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, অসমীয়ারা 'খার' খাইয়া থাকেন। এই খার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, অনেকের তাহা জানিতে আগ্রহ জন্মিতে পারে।

খার

একটী কলাগাছকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিগকে রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। সেগুলি ভালরূপ শুকাইয়া গেলে পুড়াইয়া ছাই করা হয়। এই ছাইএর নাম 'কলার খার'। হেলঞ্চ হইতেও ভাল খার প্রস্তুত করা যায়। পূর্ব্বে অসমীয়ারা লবণের পরিবর্ত্তে 'খার' ব্যবহার করিতেন। নগরবাসী অনেক অসমীয়া ভদ্রলোক লবণ অভাবে এখনও খার খাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালেও পল্লীবাসী দরিদ্র ব্যক্তিরা অর্থাভাবে লবণ ক্রয় করিতে না পারিয়া খার প্রস্তুত করত ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিলাতী লবণ আমদানী হইবার পূর্ব্বে ভুটীয়ারা অসমীয়াদিগের পল্লীতে পল্লীতে তাহাদিগের দেশজাত লবণ লইয়া

আসিত। এই লবণের রং ছিল কাল। ভুটীয়ারা, অসমীয়াদিগের নিকট হইতে কেবল বস্তুবিনিময়ে লবণ দিত। অসমীয়ারা ভুটীয়াদিগের নিকট হইতে যে লবণ লইতেন, তাঁহারা তাহা স্বেচ্ছামত ব্যবহার না করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন। বাড়ীতে জামাতা, ভাগ্নেয় অথবা অন্য কোন আত্মীয়-কুটুম্ব বা বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিলে তাঁহাকে ভাল জিনিস কে না খাওয়াইতে চান? ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন আত্মীয়কে ভুটীয়া লবণ-সংযুক্ত তরকারী খাওয়াইলে তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল বলিয়া অসমীয়ারা মনে করিতেন।

পুরুষদিগের সংস্কার

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দু মস্তকের কেশ কর্ত্তন করিতেন না, বা গায় সাবান মাখিতেন না। আমরা আসাম অঞ্চলের কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি (১৯২০ সাল) "তৎকালে সাবান মাখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।" পল্লীবাসী বহু অসমীয়া হিন্দুর মস্তকে এখনও লম্বা লম্বা চুল দেখা যায়। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পুরুষের দীর্ঘকেশ রক্ষণের উল্লেখ দেখা যায়। যাঁহারা ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন "তথাকার প্রাচীন অধিবাসিগণও লম্বা চুল রাখিত।" আসাম অঞ্চলের অবস্থাপন্ন লোকেরা ১৯০০ সালের পূর্ব্বে 'লংকেরু' ও 'গামখাড়ু' ব্যবহার করিতেন। সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুকে বিবাহাদি সংস্কার কালে লংকেরু ও গামখাড়ু পরিধান করিতেই হইত। যাঁহার এই অলঙ্কার দুইটী না থাকিত, তিনি অন্য লোকের নিকট হইতে ২।৩ দিনের জন্য চাহিয়া আনিতেন। সেখানকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল না। বাঁহী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহোদয় বলেন (১৩)—"আমি ছেলেবেলায় গামখাড়ু ও লংকেরু পরিধান

(১৩) সম্বলপুর হইতে লিখিত ২৪।২।২৫ তারিখের পত্র।

করিয়াছিলাম। এখন সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।" গামথাড়ু ও লংকেরু রৌপ্য ও স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত হয়। লংকেরুতে হীরক বা মুক্তাখচিত থাকে। আপার-আসামের শতকরা অন্যূন ৫ জন হিন্দু বর্ত্তমানেও (১৯২৪ সাল) লংকেরু পরিধান করেন। পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন অসমীয়ারা ৮।৮॥ হাত দীর্ঘ মুগার ধুতি পরিতেন—তাহা জানুর নীচে নামিত না। তাঁহারা গায়ে হাতে-সেলাই মুগার জামা (জামদানি ছোলা) ও বুকু ছোলা (waist coat) ব্যবহার করিতেন। ঐ জামায় বোতাম থাকিত না। বক্ষদেশ আবৃত করিবার ইচ্ছা হইলে অন্যূন ২॥ হাত দীর্ঘ সরু মুগা কাপড়ের ফালি দিয়া বেষ্টন করত বাঁধা হইত। ভদ্রলোকেরা মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিতেন—ছাতার অভাবে 'জাপি' ব্যবহার করিতেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সর্ব্বত্র এখনও জাপির ব্যবহার আছে। অসমীয়ারা টকৌ অথবা নাহর গাছের পাতা দিয়া জাপি আচ্ছাদিত করিতেন—উপর-আসামের উচ্চ-শ্রেণীর কোন কোন বর প্রাচীন প্রথামত এখনও (১৯২৪ সাল) বিবাহকালে গলায়—ধুকধুকি, স্বর্ণরুদ্রাক্ষ ও তিন চারি জোড়া মণি, কণ্ঠে—স্বর্ণনির্ম্মিত লোকাপার অথবা উণ্ঠি নামক অলঙ্কার পরিধান করেন। লোকাপারে হীরক অথবা মুক্তাখচিত থাকে। উণ্ঠিতে তাহা থাকে না। যাহাহউক—ভাব, ভাষা, পরিচ্ছদ ও আচার প্রভৃতি দ্বারা জাতীয়তা রক্ষিত হইয়া থাকে। যে জাতির জাতীয়তা নষ্ট হয় তাহার ধ্বংস হওয়া অনিবার্য্য।

[৩]

উজনীয়া ও ভাটী প্রসঙ্গ—মৎলিখিত আসাম প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৬০) উজনীয়া ও ভাটী শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপর-আসামের লখিমপুর অঞ্চল হইতে মধ্য-আসামের তেজপুর মহকুমা পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানকে 'উজনীয়া' এবং মঙ্গলদই মহকুমা হইতে গোয়ালপাড়া মহকুমা

আচার-ব্যবহার

পর্য্যন্ত ভূভাগকে 'ভাটী' নামে এক্ষণে আমরা অভিহিত করিলাম। এই প্রসঙ্গে ধুবড়ী মহকুমার অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হইল না। কারণ বাঙ্গালার ও এখানকার অধিবাসিগণের চালচলন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উজনীয়া ও ভাটী অঞ্চলের গুটিকতক আচার-ব্যবহারের পার্থক্য সম্বন্ধে বলিব।

[ক]

ভাটী অঞ্চলে কন্যাদাতা পাত্রপক্ষ হইতে পণ (গা ধন) * স্বরূপ ১০০৲ হইতে ৭০০৲ পর্য্যন্ত টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। উজনীয়া অঞ্চলে এই নিয়মে কার্য্য হইলে, কন্যাদাতা কন্যাবিক্রয় করিলেন বলিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহ-তত্ত্বম্ অথবা রিপুঞ্জয়-কৃত শ্রুতির বিধান অনুযায়ী তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কাশ্যপ বলিয়াছেন:—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহা কিল্বিষকারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চ সপ্তমং কুলম্।
গমনাগমনে চৈব সর্ব্বঃ শুল্কোঽভিধীয়তে॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি লোভমোহিত হইয়া অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করে সেই আত্মবিক্রয়কারী মহাপাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পাপিগণ ঘোর নরকে পতিত হয় এবং সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকভোগ করে। যাহাহউক— পাত্রপক্ষ হইতে গমনা-গমনের খরচা লওয়াও উক্ত বিধানে নিষিদ্ধ আছে। কন্যাবিক্রয়ে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কপিল বলেন:—

---

* গা ধন—কয়েক বৎসর গত হইল কামরূপের খাতি কায়স্থগণ 'আর্য্যকায়স্থ সভা' গঠনান্তর এক সভায় সংকল্প করেন, "আমরা কেহই কন্যাপণস্বরূপ নগদ ১০০৲ টাকা অথবা টাকা-কড়ি ও জিনিস-পত্রে ১০০৲ টাকার অধিক আর দাবী করিব না।" পূর্ব্বে এই জাতির অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা অসমীয়া সভ্যতার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল ছিল।

অর্থমাদায় যঃ কন্যাং দদাতি বিধিবৎ দ্বিজঃ।
মহাপাতকতুল্যানি তানি পাপানি নান্যথা ॥

অর্থাৎ—ব্রহ্মবধ, সুরাপান, গুরুপত্নী-হরণ ইত্যাদি মহাপাতকের যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, পাত্রপক্ষ হইতে কন্যাবিক্রয় অথবা কন্যাপণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

[খ]

ভাটী অঞ্চলে কন্যাদানের পর আত্মীয়গণ যে সকল বাসন-কোশন উৎসর্গ করিয়া কন্যাকে যৌতুক দেন, পাত্রপক্ষ বিবাহের পরদিন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্ত সহকারে মৎস্য, মাংসাদি ভোজন করান। যিনি যেরূপ মূল্যের বস্তু দেন, ভোজনের পর পাত্রপক্ষ তাঁহাকে তদনুরূপ মূল্যের অন্য দ্রব্য দিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই সকল গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যান। উজনীয়া অঞ্চলে এরূপ অদল-বদল প্রথা নাই। সেখানে যৌতুক দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু ভোজভাত দিবার রীতি আদৌ নাই। পাত্রপক্ষের জনৈক ব্যক্তি একটী কাঁসার পাত্রে (বটা) করিয়া একখানি বা একজোড়া চাদর, পান ও সুপারি দিয়া পাত্রীর আত্মীয়-স্বজনকে সম্মান করেন। তাঁহারা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য ঐ কংসপাত্র হইতে চাদর গ্রহণ না করিয়া কেবল পান ও সুপারি লইয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যান। আমরা শুনিয়াছি—কেহ কেহ ঐ চাদর গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি এরূপ কার্য্য করেন, সেখানকার লোকেরা তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহাকে লোভী বলিয়া নিন্দা করেন।

[গ]

ভাটী অঞ্চলের লোকেরা নাম-কীর্ত্তনের (হরি-সংকীর্ত্তনের) পূর্ব্বাহ্নে সত্রাধিকারীকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক বাড়ীতে আনাইয়া থাকেন। সেখানে তিনি নাম-কীর্ত্তন সমাপন্তে ভোজনাদি করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যান।

উজনীয়া অঞ্চলে এরূপ প্রথা একেবারে নাই। সেখানকার গৃহস্থেরা যে দিন নাম-কীর্ত্তন করাইতে ইচ্ছুক হন, সেই দিন উহা আরম্ভ করিবার অন্ততঃ ২।৩ ঘন্টা পূর্ব্বে দধি, গুড়, বোকা চাউল (কোমল) পান ও সুপারি সহ সত্রাধিকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করত আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া উহার ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা তাঁহাকে কেবল পান, সুপারি ও ৵০ আনা দক্ষিণা দিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত বাড়ীতে আসিয়া নাম-কীর্ত্তন করেন।

[ঘ]

ভাটী অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা কাপড়-চোপড় পরিয়া মলত্যাগের পর শৌচাচার অন্তে অন্যান্য কাপড়-চোপড় ও লোকজনদিগকে স্পর্শ করেন। তবে তাঁহারা স্নান না করিয়া 'গোঁসাই-ঘর'এ প্রবেশ করেন না তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান না করিয়া—সকলে নহে—অন্নভোজন করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরা শৌচাচারকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। উজনীয়া অঞ্চলের সাধারণ হিন্দুরাও শৌচাচারের পর স্নান না করিয়া কাহাকেও স্পর্শ করেন না—হঠাৎ কোন বস্ত্র স্পর্শ করিয়া ফেলিলে জলে তাহা ভিজাইয়া দেন। এইরূপ অশুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে স্পর্শ করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া ফেলেন।

[ঙ]

ভাটী অঞ্চলের কলিতা, কেওটাদি কৃষিজীবির পত্নীরা মাঠে ধান্যের চারা (কঠিয়া) রোপণ করিয়া থাকেন। কেবল বড়নগর অঞ্চলের কৃষক পত্নীদিগের মধ্যে ধান্য রোপণ ও কর্ত্তন করিবার প্রথা আছে। উজনীয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-গোস্বামী, কাথ মহাজন (১৪), উকিল, মোক্তার, মৌজা-

(১৪) কাথ মহাজন—যে সকল কায়স্থ শিষ্য ভজাইয়া গুরুগিরি করেন তাঁহাদিগকে 'কাথ মহাজন' বলে।

দার ও গভর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণিদিগের পত্নীরা মাঠে কিংবা গ্রামে অপরের বাটীতে যান না। তা ছাড়া সেখানকার অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতীয় মহিলারা মাঠে ধান্য রোপণ ও কর্ত্তন করিয়া থাকেন।

[চ]

উজনীয়া অঞ্চলের লখিমপুর জেলা হইতে নগাঁও জেলা পর্য্যন্ত ভূভাগের কোন কোন গোস্বামী ও কায়স্থ মোহন্তগণের পুত্রেরা পিতাকে

সম্বন্ধসূচক সম্ভাষণ

আতা, মাতাকে আই জ্যেঠামহাশয়কে বড় আতা জ্যেঠাইমাকে বড় আই, কাকা (খুড়া)কে খুড়া কাকিমাকে খুড়ি মামাকে মোমাই ও মাসিমাকে মাই বলিয়া ডাকেন। সেখানকার সকল শ্রেণীর লোকেরা বড় পিসি ও বড় মাসীকে জেঠাই—তাঁহাদিগের স্বামীকে জেঠপা, ছোট পিসিকে পেহি—তাঁহার স্বামীকে পোহা, ছোট মাসীকে মাহী—তাঁহার স্বামীকে মোহা, জ্যেষ্ঠ ভগ্নীকে বাই, বাইদেউ, বাইটী, বাইটা এই চারিটী নামের যে কোন একটী নামে এবং ছোট ভগ্নীকে আইটী বা আইকন নামে ডাকেন। সকল শ্রেণীর লোকেরা পিতামহ ও মাতামহকে ককা, পিতামহী ও মাতামহীকে বুড়ী আই বলেন। পিতা পুত্রকে পুত্র ও কন্যাকে জিয়ারি এবং সকল শ্রেণীর লোকেরা জামাতাকে জোয়াই (জোৱাই), পুত্রের পুত্র ও কন্যার পুত্রকে নাতি, পুত্রবধূকে বোয়ারি (বোৱারি), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাদা এবং তাঁহার স্ত্রী (বউদিদি কে বউ অথবা ন বউ, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ময়না অথবা তাহার নিজ নাম ধরিয়া ডাকেন। তাঁহারা ময়নার স্ত্রীকে ভাই বোয়ারি, বড় ভগ্নীপতিকে ভিনিহি, ছোট ভগ্নীপতিকে বইনাই বলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা উভয়েই উভয়ের পুত্র-কন্যাগণকে ভতিজা, বড় ভগ্নীপতি ও ছোট ভগ্নীপতি উভয়ে উভয়কেই শালপতি বলেন। সকল শ্রেণীর লোকেরা শ্বশুরকে শহু,

শাশুড়ীকে শাহু, ভাসুরকে জেঠালত দেবরকে দেবর বা দেয়োর বড় ননদ (বড় ঠাকুরঝি)কে কেয়োশাহু—ছোট ননদকে আইটী অথবা আইকন, জ্যেষ্ঠ শ্যালককে জেঠেরি কনিষ্ঠ শ্যালককে খুলখালি বা খুলশালি এবং জ্যেষ্ঠ শ্যালিকাকে জেশাহু বলেন।

উজনীয়া অঞ্চলের গোস্বামীদিগের বাটীর লোকেরা পিতাকে দেউ, মাতাকে বউ, জ্যেঠামহাশয়কে বড় দেউ জ্যেঠাইমাকে বড়বউ জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রীকে ন বউ বলেন। সেখানকার কোন কোন ব্রাহ্মণ পিতাকে পিতা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বাপু বলেন। তাঁহারা জ্যেঠামহাশয়কে বড় বাপু ও জ্যেঠাইমাকে বড় মা বলেন। পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা পিতার দিদিমা অথবা ঠাকুরমাকে এবং জ্যেঠাইমাকে বড় মা বলিয়া ডাকেন। যাহাহউক —উজনীয়া অঞ্চলের শূদ্রেরা পিতাকে পিতা অথবা বোপাই বলেন। সেখানকার মুন্সেফ, মৌজাদার, পুলিস ও কেরাণি শ্রেণীর লোকেরা পিতাকে দেউতা মাতাকে বউ বা মা পিতামহী ও মাতামহীকে আইটা বলিয়া সম্ভাষণ করেন। পিতা স্নেহসূচক-ভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বড় দেকা ও কনিষ্ঠ পুত্রদিগকে বাপুকন, ময়নাকন, সোনকন এই তিন নামের যে কোন একটী নামে ডাকিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উজনীয়া অঞ্চলের আহোম জাতির লোকেরা পিতাকে বোপাই, মাতাকে আই পিতামহকে দেউতা পিতামহীকে বুঢ়ী আই বা বুড়ী আই বলিয়া ডাকেন।

দরঙ্গ জেলার মঙ্গলদৈ অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা পিতাকে পিতা না বলিয়া উহার পরিবর্ত্তে বাপা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আহোম জাতির লোকেরা পিতাকে বোপাই বলেন। দরঙ্গ জেলা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুরা পিতামহ

ও মাতামহকে আতা বলিয়া থাকেন। মঙ্গলদৈ অঞ্চলের লোকেরা পিতামহী ও মাতামহীকে আবু ও বুড়ী আই এই দুইয়ের কোন একটী নামে ডাকেন। দরঙ্গ জেলার অসমীয়া হিন্দুরা মাতাকে আই অথবা বউ এবং জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রীকে ন বউ বলেন। আজকাল সেখানকার ও উপর-আসামের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে মাতাকে বউ এর পরিবর্ত্তে আই বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কামরূপের অসমীয়া হিন্দুরা পিতামহী ও মাতামহীকে আবু বলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা পিতাকে পিতা বলিয়া ডাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকেরা অধিকাংশ সময় তাঁহাকে বাপা এবং কখন কখন পিতা বলিয়াও থাকেন। নিম্ন-আসামে মাতাকে মাই অথবা আই, বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বউ, জ্যেষ্ঠ শ্যালককে জেঠেরির পরিবর্ত্তে বরগিরি অথবা কুর্ম্ম কনিষ্ঠ শ্যালককে খুলশালী বড় ভগ্নীপতিকে ভিনিহি এবং ছোট ভগ্নীপতিকে বইনাই বলা হয়। কামরূপের ব্রাহ্মণ—কোন কোন কায়স্থ—ও দৈবজ্ঞ জাতির লোকেরা বড় ভাইকে দাদা বলেন; কিন্তু সেখানকার অন্যান্য জাতির লোকেরা তাঁহাকে কাকা অথবা ককাই বলিয়া ডাকেন। এই তিন জাতির লোকেরা কাকাকে খুড়া কিন্তু অন্যান্য জাতির লোকেরা তাঁহাকে দাদা বলেন। নিম্ন-আসামে শ্বশুর-শাশুড়ীরা পুত্রবধূকে বোয়ারি এবং বড় ভাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ভাই বোয়ারি বলিয়া থাকেন।

[৪]

মহিলাদিগের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের মহিলারা কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত যে পরিচ্ছদ পরিধান করেন তাহাকে "মেখেলা" এবং মস্তক হইতে কোমর পর্য্যন্ত (বঙ্গ মহিলারা

শাড়ীর উপরিভাগ কোমর পর্য্যন্ত ঠিক যেরূপভাবে জড়াইয়া থাকেন) আর যে একটী পরিচ্ছদ জড়ান উহাকে "রীহা" বলা হয়। তাঁহাদের রীহা, মেখেলা সাধারণতঃ মুগা কাপড় দিয়া প্রস্তুত। মঙ্গলদৈ হইতে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কেওট ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কোচ মহিলারা বুক—স্তনযুগলের উপর—হইতে পা পর্য্যন্ত মেখেলা নামে একটী বৃহৎ কাপড়ের খোল দিয়া আবৃত করেন এবং তদুপরি রীহা কিংবা আগুরণ নামক একখানি ছোট কাপড় জড়ান। ইহার উপর উড়নি থাকে। সেখানকার কোন কোন জাতির মহিলা-দিগের একখানি গামছা দ্বারা মস্তকের আবরণ হয়। উপর-আসামে দৈবজ্ঞদিগের পৃথক্ গ্রাম নাই। তাঁহারা যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের মহিলারা যেরূপ ধরণে পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান করেন তাঁহাদের পত্নীরাও সেইরূপ ধরণের অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সেখানকার কোন শ্রেণীর মহিলা রীহা অথবা মেখেলা পরিধান করেন না। উজনীয়া অঞ্চলের কোন স্থানে মহিলাদিগের মধ্যে এখনও (১৯২৪ সাল) শাড়ীর প্রচলন হয় নাই। শাড়ীর উপর তাঁহাদের একটা বিজাতীয় ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ মহিলাদিগের সংস্পর্শ হেতু নিম্ন-আসামের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য নগরীতে উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুমহিলারা আজকাল বাড়ীতে শাড়ী পরা ধরিয়াছেন। তবে কাহারও বাটীতে উহা পরিধান করিয়া তাঁহাদিগের যাইবার রীতি এখনও হয় নাই। বাড়ীতে কোন আত্মীয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাড়াতাড়ি শাড়ী ছাড়িয়া রীহা-মেখেলা পরিধান করিয়া থাকেন; কেননা—জাতীয় প্রথা অনুসারে উহা ব্যবহার করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শাড়ী অপেক্ষা রীহা, মেখেলা অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইলেও নিম্ন-আসামের কোন পল্লীবাসিনী—যতই তাঁহার হীনাবস্থা হউক না—এখনও শাড়ী পরিতে ঘৃণা বোধ করেন।

লখিমপুর অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা সাধারণতঃ কাণে—কেরু ; কণ্ঠে—মণি এবং হস্তে—সুবর্ণ বলয় পরিধান করেন। তাঁহারা কাণে—সোণার 'করিয়া' কিংবা কোমরে—করধনি পরিধান করেন না। শিবসাগর অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর মহিলারা আঙুলে—আংটি ; কণ্ঠে—গেজেরা, মাহুলি (১৫) আদমহীয়া, চরতিয়া, ওলোমা, চিপাৎ চাকুলি, ধুকৃধুকি, করিয়া, বিড়ী ও বেণা এই কয়েকটা বাখর সংযুক্ত স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে সেখানে রৌপ্যনির্ম্মিত অঙ্গুরী, জোন বিড়ী ও মাহুলি প্রচলিত ছিল। শিবসাগর জেলার গোলাঘাট মহকুমায় রৌপ্য-শিল্প বিলুপ্ত হইয়াছে। নগাঁও অঞ্চলের ও তেজপুর মহকুমার উচ্চ-শ্রেণীর মহিলারা আঙুলে—আংটি ; হাতে—সচরুয়া খাড়ু অথবা বালা ; কাণে—থুরিয়া, করিয়া ও কেরু এবং কণ্ঠে—গলপতা, মণি, মাহুলি, গেজেরা ও ধুকৃধুকি পরিধান করেন।

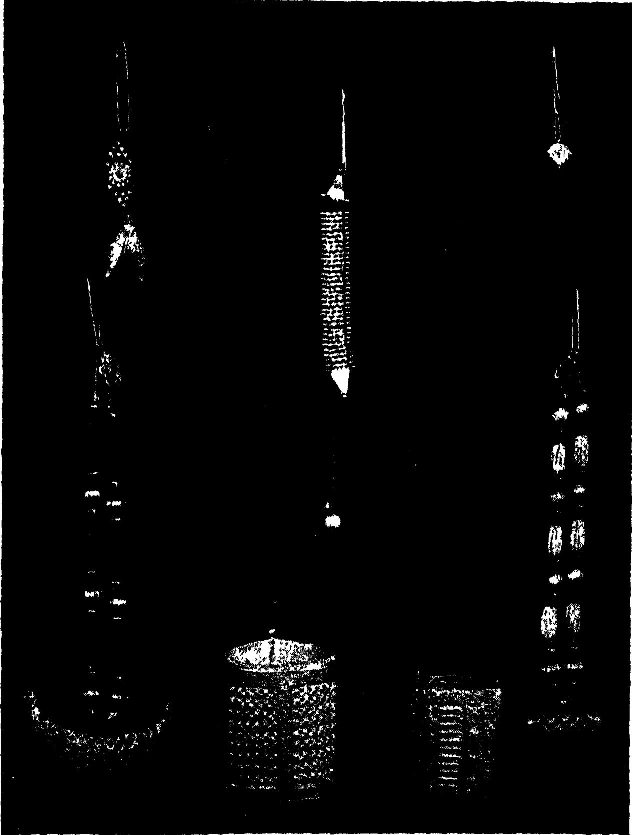
নিম্ন-আসামের হিন্দু মহিলারা অলঙ্কারের মধ্যে কাণে—'সোণা', উপর কাণে—পিপ্‌লিপাতা * নাকে—নথ ; হাতে—কঙ্কণ, পাতিয়া খাড়ু বা মুঠি, বাহুতে বাজু, তার ; পায়ে—লেম্পুর, মল এবং পায়ের উপরে আড়বেকী পরিধান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের মধ্যে সোণার বাখরপাতা 'মুঠি খাড়ু'র তেমন প্রচলন নাই। মুঠি খাড়ুগুলি সাধারণতঃ ৩।৪ আঙুল চওড়া। পতিয়া খাড়ুগুলি সরু। উক্ত সোণার মধ্যে জিঞ্জির আছে। এই সকল অলঙ্কার ব্যতীত কেহ কেহ কোমরে—করধনী ; গলায়—গলপতা, বিড়ী, হার, দানামণি ও মাহুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজকাল (১৯২৪ সাল) কঙ্কণ, তার, মাহুলি ও লেম্পুরের ব্যবহার অসমীয়া মহিলা সমাজে অত্যন্ত কম—অধিকাংশ

---

(১৫) মাহুলি দুই প্রকার—বাখরাণি ও উকা। বাখর সংযুক্ত মাহুলিকে বাখরাণি এবং যাহাতে উহা থাকে না তাহাকে "উকা" বলে।

* পিপ্‌লিপাতা—কামরূপের টীহু ও বড়পেটা অঞ্চলে ইহার প্রচলন নাই।

অসমীয়া হিন্দুমহিলাদিগের কয়েকটী অলঙ্কার।



[উপরে বাম দিকে সোণা (করিয়া); মধ্যে বাজু নামক বাহুভূষণ, তাহার পার্শ্বে পিপ্‌লিপাতা ; পিপ্‌লিপাতার নীচে মাহুলীসহ "মণি"। বাম দিকে সোণার নিয়ে জোন বিড়ী। মাঝের অলঙ্কার দুইটী নাম 'খাড়ু']

স্থান হইতে এই সকল লোপ পাইয়াছে। মাদুলির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মধ্যে হার ব্যবহৃত হইতেছে। তবে কোন কোন সাধারণ গৃহস্থের গৃহে উহার প্রচলন আছে। বর্ত্তমানে নিম্ন-আসামের অধিকাংশ অসমীয়া মহিলা বাজু ও তারের পরিবর্ত্তে 'অনন্ত' ব্যবহার করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা দুই তিন জোড়া 'তার' ব্যবহার করিতেন। কামরূপের গৌহাটী, ও বরপেটা অঞ্চলের মহিলারা 'থুরিয়া' ব্যবহার করেন না। তাঁহারা উহার পরিবর্ত্তে 'করিয়া' ব্যবহার করেন। এই 'করিয়া'কে চলিত কথায় 'সোণা' বলা হয়। সোণাগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত। সোণা, কঙ্কণ, তার, আড়বেকি ও লেম্পুর এই পাঁচটী অলঙ্কার অসমীয়াদিগের নিজস্ব নয়। এই প্রকারের গহনাগুলি আমরা বিগত ১৩২২ বঙ্গাব্দে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। উজনীয়া অঞ্চলের কোন কোন স্থানের মহিলা বর্ত্তমানেও শাঁখা পরিধান করেন। পূর্ব্বে মধ্য-আসামে ও উপর-আসামে অসমীয়া হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে শাঁখার বহুল প্রচলন ছিল। এই দুই অঞ্চল হইতে শাঁখা বিলুপ্ত হইয়াছে। কামরূপ জেলায় কন্যার বিবাহকালে খাড়ুর ব্যবহার চিরন্তন প্রথা। গোয়ালপাড়া মহকুমায় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির কন্যারা তৎকালে খাড়ুর পরিবর্ত্তে সুবর্ণ বলয় এবং দরিদ্র ব্যক্তির কন্যারা সোণার পাত দিয়া বাঁধান শাঁখা পরিধান করিয়া থাকেন। কামরূপ অঞ্চলে ব্যবহৃত খাড়ুগুলি সাধারণতঃ রৌপ্যনির্ম্মিত। সেখানকার কোন কোন ধনী ব্যক্তি খাড়ুর মুঠির উপর সোণার পাণ দেওয়াইয়া লন। অসমীয়ারা ইহাকে 'সোণ খটোয়া মুঠি' বলেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলে খাড়ুর ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পার্শী শাড়ী, পার্শী মাকড়ী প্রভৃতি যে কয়েকটী বিজাতীয় পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার বঙ্গীয় মহিলা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের একটীও অদ্যাবধি (১৯২০ সাল) কোন অসমীয়া পল্লীতে স্থান পায় নাই।

অসমীয়া হিন্দুদিগের জাতীয় উৎসব

পঞ্চম অধ্যায়

চত বিহু ও কাঙ্গালী বিহু=বিষুব সংক্রান্তির অপভ্রংশ বিহু। বিহু অসমীয়াদিগের একটী জাতীয় পার্ব্বণ। আসাম প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ডে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমরা ইহার বিষয় সবিশেষ বলিয়াছি। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য চত বিহু ও কাঙ্গালী বিহু সংক্রান্ত অনুক্ত বিষয়গুলি নিম্নে বিবৃত করা হইল।—

অসমীয়ারা চৈত্র সংক্রান্তির বিহুকে 'চত বিহু' বা 'বহাগ বিহু' বলিয়া থাকেন। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে এই বিহুর উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। বহাগ বিহুর কয়দিন রাত্রে ব্যতীত দিবাভাগে অসমীয়া হিন্দু মহিলাগণ উনান (চুল্লি) জ্বালেন না। উজনীয়া অঞ্চলে তৎকালে 'শরণ'-প্রাপ্ত ও দীক্ষিত ব্যক্তিগণ ১টার সময় এবং কিশোর-কিশোরিগণ ১০টার সময় নানাবিধ পিঠা ভোজন করেন। উজনীয়া অঞ্চলে এই পিঠাগুলির নাম যথা—ঘিলা পিঠা, খোলা ছপরীয়া, বড়পিঠা, হেছাপিঠা, ভুরভুরিয়া, বুরুকিয়া, ফেণিপিঠা, খুর্ম্মা পিঠা প্রভৃতি। 'বরা' নামক আটাযুক্ত এক প্রকার ধান্যজাত তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা বিভিন্ন প্রণালীতে এই সকল পিঠা প্রস্তুত হয়।

আসামে যেরূপভাবে বিহু উৎসব হয় আধুনিক আসামভুক্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলে কোন জাতির মধ্যে সেরূপভাবে হয় না। সেখানকার লোকেরাও পৌষমাসের সংক্রান্তিকে 'বিহু' বলিয়া থাকেন। এই বিহু যে বিষুব সংক্রান্তির অপভ্রংশ তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই সংক্রান্তির দিন সকল শ্রেণীর হিন্দুরা প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করেন। সেদিন তাঁহাদিগের গৃহে পুলিপিঠা, রুটিপিঠা, চিতলপিঠা, মশকি

পিঠা, কুলাকুলি পিঠা, দুধচুরি বা চইমই পিঠা ও অন্যান্য নানাবিধ পিঠা প্রস্তুত হয় এবং সেদিনের মত তাঁহারা কেবল উহাই খাইয়া থাকেন। বালক বালিকারা প্রত্যুষে স্নান করিয়া রাশীকৃত নাড়াঘরে অথবা ২।১ দিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত খোড়োঘরে অগ্নিসংযোগ করিয়া পরস্পর কৌতুক করে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে খড়ের নাড়াঘরকে 'মেড়ামেড়ির ঘর' বলা হয়। সেখানকার বয়স্থ ব্যক্তিরা মেড়ামেড়ির ঘরে অগ্নিপ্রদান উপলক্ষে যোগদান করেন না।

শ্রীহট্টে যেমন পৌষ বিহু উপলক্ষে প্রত্যুষে স্নান, পিষ্টক ভোজন ও খড়ের নাড়াঘরে আগুন দিবার প্রথা আছে, নিম্ন-আসামে ও উপর-আসামে ঠিক তাহাই আছে। অসমীয়ারা খড়ের নাড়াঘরকে 'পুঁজি' ও এই পৌষ সংক্রান্তির বিহুকে 'মাঘ বিহু' বলেন। কারণ পৌষ মাসের শেষ দিনকে 'বিহু' এবং মাঘ মাসের প্রথম দিনকে 'বড় বিহু' বলা হয়। এই বিহুকালে তাঁহারা চিড়া ও পিঠা ভোজন এবং নাম-প্রসঙ্গ করেন। কামরূপের লোকেরা বিহুকে 'দমাহি' বলেন, যথা—মাঘর দমাহি, বহাগর দমাহি।

উপর-আসামে (Upper Assam) এই চত বিহুকালে যে দিন 'গরু বিহু' হয়, সেই দিন বাড়ীর লোকেরা এক হাত দীর্ঘ একটী বংশ শলাকে দুই তিন ভাগে চেলা করিয়া তাহার অগ্রভাগ ছুঁচাল করে। অতঃপর তাহারা উহাতে খণ্ডীকৃত লাউ, বেগুন, করলা, হরিদ্রা, বর-ঠেকেরা (১৬) প্রভৃতি পর পর গাঁথে। সেখানকার লোকেরা যে বংশ ফলককে এই সকল খণ্ডীকৃত দ্রব্য গ্রথিত করে তাহাকে 'ছাত' বলা হয়। যেখানে গরুদিগকে স্নান করান হয়, সেখানে ঐ 'ছাত'টীকে একটী চেলুনিতে রাখিয়া কলাপাত দ্বারা আবৃত করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

(১৬) এক জাতীয় অম্লফল বিশেষ। বঙ্গদেশে এই ফল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহার আকৃতি অনেকটা খুব বড় কাঁচা ন্যাসপাতি ফলের মত।

গরুগুলিকে স্নান করান হইলে বাড়ীর লোকেরা নিজ নিজ "ছাত" হইতে খণ্ডীকৃত লাউ, বেগুন প্রভৃতি টানিয়া লইয়া উহাদের দ্বারা তাহাদিগের সমস্ত দেহ উত্তমরূপে ডলিয়া দিতে দিতে "লাউ খা, বেঙ্গেনা খা, করোলা খা, হালধি খা, বড়ঠেকেরা খা ; মার সরু, বাপের সরু, তই হবি বর বর গরু" এই কথাগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে। ছাতটীতে লাউ কিংবা বেগুনের সামান্য অংশ থাকিতে থাকিতে একজন আর একজনের সহিত অদল-বদল করেন। অসমীয়ারা ইহাকে 'ছাত সলোয়া' বলেন। এইরূপ কার্য্য শেষ হইলে তাহারা ঐ ছাতটাকে নিজ নিজ বাটীস্থ গোয়ালঘরে আনিয়া তুলিয়া রাখেন।

ইহার পর বাড়ীর ছেলেরা নববস্ত্র পরিধান করিয়া 'নামঘর'এ আসে। শিষ্যগণ সেখানে আসিয়া খোল, মৃদঙ্গ বাজাইয়া হরি-কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দ করেন এবং একটী পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ চাউল, একখানি গামছা, কতকগুলি পান ও তাম্বুল দিয়া গুরুকে প্রণাম করেন। প্রণামকালে তাঁহারা ৵০ আনা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত দক্ষিণা দেন। গুরু তাঁহার শিষ্যদিগকে ফুল, তুলসী ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদানের পর সমীপস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অবশিষ্ট হইতে কিয়দংশ বণ্টন করিয়া দেন। গুরুকে প্রণাম না করা পর্য্যন্ত শিষ্যগণ উপবাসী থাকেন।

গরু বিহুর পর দিন 'মানুহ বিহু'র অনুষ্ঠান হয়। সেইদিন সকলেই তেল-হলুদ মাখিয়া স্নান করে। মানুহ বিহুর পর দিন 'চেরা বিহু'। কোন কোন সত্রে গুরু তাঁহার সত্রস্থ ভক্ত বা শিষ্যদিগের আয়ু ও বল বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার সুগন্ধ মিঠাই প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। এই সুগন্ধ মিঠাই কি কি উপকরণ দিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহা জানিবার জন্য পাঠক-পাঠিকাগণের আগ্রহ জন্মিতে পারে। আতপ তণ্ডুল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎসহ গোলমরিচ, কর্পূর, লবঙ্গ, জায়ফল, এলাচ, দালচিনি, তেজপত্র, দুই প্রকার জিরা (কাল

ও সাদা জিরা), জনি (এক প্রকার মশলা), ধনে ও জাইপত্র এই সকল মশলাকে এক সঙ্গে ভাজিবার পর উদুখলে চূর্ণ করা হয়। অনন্তর একটী পাত্রে করিয়া খানিকটা গুড় অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া উদুখলে কুট্টিত উপরিউক্ত দ্রব্যগুলিতে তাহা মাখাইয়া লাড়ুর আকারে পরিবর্ত্তিত করা হয়। এই লাড়ুকে 'সুগন্ধী মিঠাই' বলা হইয়াছে। গুরু, গোঁসাই (দেবতা)কে এই লাড়ুগুলি উৎসর্গ করিবার পর শিষ্যগণকে দিয়া থাকেন। তাঁহারা পান, সুপারি ও দক্ষিণাদি সহ ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। ভক্তগণের এই প্রণামকে অসমীয়ারা 'নির্ম্মালি দিয়া' বলেন। বিহু উপলক্ষে পাওনা-গণ্ডার জন্য উপর-আসামের কোন গুরু শিষ্যবাড়ী যান না। সাধারণ শিষ্যগণ তৎকালে তাঁহার সত্রে গিয়া সাধারণতঃ তাঁহাকে ৵০ আনা হইতে ৷৷০ আনা পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিয়া থাকেন।

চত বা বহাগ বিহুকালে উজনীয়া অঞ্চলের নিম্ন-শ্রেণীর অসমীয়াগণের মধ্যে খুবই নাচ-গান ও আমোদ-আহ্লাদ হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় এরূপ প্রথা নাই। সেণ্ট্রাল বা মধ্য-আসামের নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হইয়া প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বহাগ বিহুর নাচ গান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ১৯১৫ সালের পূর্ব্বে লখিমপুর ও শিবসাগর জেলার কলিতা, কেওট, কোচ, নদীয়াল, হাড়ি, শুভ আহোম প্রভৃতি জাতির অবিবাহিত কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীগণ গ্রামের বহির্ভাগস্থ ময়দানে গাছতলায় অথবা জঙ্গলের মধ্যস্থ নিভৃত স্থানে গিয়া নাচ করিত ও পীরিতি গান গাহিত। গ্রাম্য যুবকেরা তাহাদিগের নাচ-গান দেখিবার জন্য অদূরে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। বৃক্ষতলস্থ কোন কিশোরী বা যুবতী জনৈক কিশোর বা যুবককে লক্ষ্য করিয়া গীত গাহিত। যে যুবককে লক্ষ্য করিয়া গীত গাওয়া হইত—পূর্ব্ব হইতে সে তাহার উপর অনুরক্ত

বিহুর নাচ-গান

ছিল বুঝিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যাইত—কিয়ৎক্ষণ নৃত্য-গীতের পর তাহারা অন্যত্র কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সেইখানেই নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্যতার হাওয়া লাগিবার ফলে, লোক-লজ্জায় পড়িয়া—বিশেষতঃ গোস্বামীদিগের দাপটে —ঐ সকল জাতির অবিবাহিত পুষ্পিত কন্যাগণ তৎকালীন নৃত্য-গীতে যোগদান করিতে নিবৃত্ত হয়। তাঁহাদের নিষেধ সত্ত্বেও যে সকল যুবক বহাগ বিহুকালে গোপনে এই নৃত্য-গীতে যোগদান করে, গ্রাম্য মণ্ডলগণ জানিতে পারিলেই 'আক্কেল সেলামি' বাবদ তাহাদিগকে ৫৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কোন "শরণ"প্রাপ্ত কিশোর অথবা যুবক এইরূপ কার্য্য করিবার পর জানাজানি হইলে তাহার গোস্বামী প্রভুকে ১।০ সিকা এবং গ্রাম্য মণ্ডলকে ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়। আপার-আসামের সকল স্থান হইতে এখনও (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই প্রথার মূলোচ্ছেদ হয় নাই। সেখানকার নিম্ন-শ্রেণীর অবিবাহিত যুবকেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে—গভীর জঙ্গলের মধ্যে—খুব হুঁসিয়ার হইয়া যুবতীগণকে লইয়া তৎকালে নৃত্য-গীতসহ আমোদ-প্রমোদ করে। মধুমাসের শেষান্তে বহাগ বিহুর দিনে নিম্ন-শ্রেণীর কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী মৎসংগৃহীত নিম্নলিখিত ধরণের গীত গাহিয়া থাকে :—

১। বিহু গীত

পৰথমে পৰনামো দেবী সৰস্বতী,
দ্বিতীয়ে পৰনামো হৰি ;
তৃতীয়ে পৰনামো গাঁওৰ বুঢ়ামেঠা,
ধৰি যাওঁ নামৰে গুৰি।

নামৰে কঠিয়া ঈচৰে দিছিলে,
ব্ৰহ্মায়ে সৰজা নাম ;
বেয়া নাম ওলালে ক্ষেমিবা সকলে
পোণতে পীৰিতি গান। **

[সাধরণতঃ উপরিউক্ত গীতের পর বিহু গীতি আরম্ভ হয়]

২। বিহু গীত

কলৈ যা কলিয়া গধূলি বেলিকা মোকে আলি ৰাটত থৈ।
বুদ্ধি চলনেৰে চলিলি কলিয়া কালিনি ভোমোৰা হৈ॥
ইনৈ বুৰে মাৰি সিনৈয়ে ওলালে কাৰে পোহনীয়া উদ।
মাটি ফুটি ওলালে তৰাৰে গজালি হিয়া ফুটি ওলাল দুদ॥ †

৩। বিহু গীত।

ইনৈয়ো আমাৰে সিনৈয়ো আমাৰে এটাইবোৰ আমাৰে নৈ।
থাক মনি হেৰালে চিন্তা নকৰিবা সোনাৰি আমাৰে পৈ॥
আউলি ধানকে দাবলৈ যাওতে বাউলি ৰতাহে পালে।
কাছি দলি মাৰি সোমাল হাবিতলে শৰিৰত ববলে খালে॥ ‡

** শব্দার্থ=পর্নামো—প্রণাম। বুঢ়ামেঠা—গ্রামস্থ বৃদ্ধলোক। গুরি—হাল (helm). কঠিয়া—বীজ। সরজা—সৃজিত। বেয়া—কুৎসিৎ। ওলালে—বাহির হইলে।

† কলৈ যা—কোন দিকে যাও। কলিয়া—এক ব্যক্তির নাম। গোধূলি বেলিকা—সন্ধ্যার সময়। বুদ্ধি চলনরে—প্রকৃত কথা না বলিয়া। চলিলি—প্রবঞ্চনা করিলে। কালিনি—এক প্রকার ভ্রমরার আকৃতি ধরিয়া। ইনৈ বুরে মারি—এক নদীর জলে ডুব দিয়া। সিনৈয়ে ওলালে—আর এক নদী হইতে বাহির হইয়া আসিলে। কারে—কোন ব্যক্তির। পোহনীয়া—গৃহপালিত। উদ—এক জাতীয় জলজন্তু। মাটী ফুটী—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া। ওলালে—বাহির হইল। তরা—এক জাতীয় ঘাস।

‡ ইনৈয়ো—এ নদী ; আমারে—আমার ; সিনৈয়ো—সে নদী ; এটাইবোর—সমস্ত ; পৈ—স্বামী ; দাবলৈ—কর্ত্তন হেতু ; কাছি—কাস্তে ; দলিমারি—ফেলিয়া দিয়া ; সোমাল—প্রবেশ করিল ; খালে—কামড়াইল, অর্থাৎ দংশন করিল।

৪। বিহু গীত

১। "হাঁহ হৈ চৰিম গৈ তোমাৰ পুখৰীত
পাৰ হৈ পৰিম গৈ চালত।
চৰাই হৈ পৰিম গৈ তোমাৰ ফুলনীত
মাখি হৈ পৰিম গৈ গালত॥

২। পানি দেখি লাগিল পানিৰো পিয়াহ'
তোমাক দেখি লাগিল দয়া।
মুঠিৰ কটা তামোল মুঠিতে শুকালে
নহলা নিজৰে গঞা॥

৩। তোমাৰ বাৰীত ফুলিলে ইন্দ্ৰজিত মালতি
আমাৰ বাৰীত পৰিলে ছাঁ।
ফুলৰ গোন্ধ পাই থাকিব নোয়াৰোঁ
দেহ পুৰি মৰে গা॥"

অর্থাৎ—(১) আমি হাঁস হইয়া তোমার পুষ্করিণীতে চরিব; পায়রা হইয়া তোমার ঘরের চালে বসিব; পক্ষী হইয়া তোমার ফুলবাগানে ঘুরিব; মক্ষিকা হইয়া তোমার গালের উপর বসিব। (২) জল দেখিয়া জলতৃষ্ণা হইল; তোমাকে দেখিয়া আমার দয়ার উদ্রেক হইল। আমার হাতের মুঠার পান, হাতের মুঠার মধ্যে শুকাইয়া গেল; (যদিও) তুমি আমার গ্রামবাসী নহ—অর্থাৎ তুমি আমার গ্রামবাসী না হওয়ার দরুণ, তোমাকে তৈয়ারী পান দিবার সুবিধা পাইলাম না, এবং সেইজন্য উহা হাতের মুঠার মধ্যে শুকাইয়া গেল। (৩) তোমার বাগানে ইন্দ্রজিৎ, মালতী ফুল ফুটিল; কিন্তু আমার বাগানে তোমার ফুল গাছের ছায়া পড়িল। আমি ফুলের গন্ধ পাইয়া থাকিতে পারিলাম না; আমার দেহ পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে—অর্থাৎ তোমাকে দেখিয়া আমি অস্থির হইতেছি।

কাঙ্গালী বিহু—বহুকাল হইতে বঙ্গদেশের বহু পল্লীতে কার্ত্তিক মাসের কয়দিন যাবৎ সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুবৃহৎ বংশখণ্ডের অগ্রভাগে সুদীর্ঘ রজ্জু-সাহায্যে 'কপিকল'-প্রণালীতে লণ্ঠন ঝুলাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা আছে। ঐ প্রদীপকে "আকাশ প্রদীপ" বলা হয়। হিন্দুরা জৈনদিগের নিকট হইতে এই প্রথা পরবর্ত্তী কালে গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে সাধু ভাষায় ইহাকে 'দীপালী' এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'দেওয়ালী' বলা হয়। 'কাতি বিহু' বা "কাঙ্গালী বিহু"র কয়দিন সন্ধ্যাকালে উজনীয়া অঞ্চলের সত্রগুলিতে আকাশ প্রদীপ দিবার প্রথা আছে। সেখানকার লোকেরা তৎকালে এরূপ তারস্বরে জয়ধ্বনি করেন যে, মনে হয়—পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। আকাশ প্রদীপটী সুদীর্ঘ রজ্জু-সাহায্যে 'কপিকল' প্রণালীতে উপরে উঠিয়া গেলে তাঁহারা মহানন্দে গীত গাহিয়া থাকেন। তৎকালে বাদ্যকরেরা বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলে। যাহা হউক, অসমীয়ারা আকাশ প্রদীপকে 'আকা বাটী' বলেন। পার্শ্বে 'আকা বাটীর চিত্র' প্রদর্শন করা হইল। শিবসাগর জেলাস্থ আউনীআটী সত্রে কাতি বিহুর দিন সন্ধ্যাকালে অন্যূন ২৪।২৫ জোড়া আকা বাটী জ্বালান হয়। অন্যান্য সত্রের গোঁসাইদিগের সেরূপ বাহুল্য নাই। তাঁহারা এক জোড়া—জোর দুই জোড়া—আকা বাটী প্রদানের ব্যবস্থা করেন।


[আকা বাটীর চিত্র]

অসমীয়াদিগের আকা বাটী যাহার উপর উত্তোলন করা হয়, তাহা কোন্ দ্রব্য এবং কি প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয় এক্ষণে তাহা বলা যাউক। দুইটী সুদীর্ঘ বংশদণ্ড—পরস্পর ২ হাত অথবা ২॥ হাত ব্যবধানে—অন্যূন পাঁচ পোয়া পরিমাণ গভীর করিয়া মাটিতে পোতা হয়। চিত্রে যে সকল চক্র দেখা যাইতেছে, সেগুলি বাঁশের চেড়ি দিয়া খুব মজবুত করিয়া প্রস্তুত। সুশোভন দৃশ্যের জন্য ঐ চাকাগুলির পা-দিয়া মাঝামাঝি ভাবে একটী ত্রিশূল খাড়া করিয়া রাখা হয়। চক্রগুলি ঐ ত্রিশূলের সহিত দৃঢ়ভাবে দড়ি দিয়া বাঁধা। সর্ব্বনিম্নস্থ সুবৃহৎ চক্রটীর উপরে যে দুইটী ছোট চক্র রহিয়াছে, সেই দুইটীর মধ্য দিয়া ত্রিশূলের গাত্র স্পর্শ করিয়া একটী বাখারি গিয়াছে, তাহাও দড়ি দিয়া বাঁধা। এই চক্র দুইটীর মধ্যস্থ—উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত—চেড়িটীও রজ্জুবদ্ধ থাকায় উপরিস্থ চক্র তিনটীর ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। বৃহত্তম চক্রের নিম্নভাগে সুদৃশ্য প্রদীপাবরণ দুইটী সুদীর্ঘ রজ্জু-সাহায্যে ‘কপিকল-প্রণালী’তে অবাধে উঠান ও নামান যায়।

অসমীয়া কায়স্থ প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ অধ্যায়

কামরূপাগত কনৌজীয় চণ্ডীবর, শ্রীধর, শ্রীহরি প্রভৃতি কায়স্থ অতি বিশুদ্ধ ছিলেন। এককালে কামরূপে ইঁহারা প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। কালক্রমে ইঁহাদের বংশধরগণ জনসংখ্যায় ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে ইঁহারা শৌর্য্যবীর্য্য ও বৃত্তি-সম্পদ্ হীন হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে অধিকাংশ অসমীয়া 'খাতি' (বিশুদ্ধ) কায়স্থের অবস্থা অস্বচ্ছল হইলেও তাঁহারা দীনভাবে কালযাপন করিতে প্রস্তুত, তথাপি আপনাদের ঐহিক উন্নতিকল্পে সাবেক জাতীয় প্রথার একটু এদিক্-ওদিক্ চলিতে ইচ্ছুক নহেন। অসমীয়া বিশুদ্ধ কায়স্থদিগের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিবার প্রধান কারণ হইতেছে, আসামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা না থাকা। অন্যদিকে, যাঁহারা হলচালন করিতে পারেন, উত্তরোত্তর তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

আমরা সবিশেষ অনুসন্ধানান্তে বলিতেছি যে, অসমীয়া বিশুদ্ধ কায়স্থেরা বাঙ্গালার কুলীন কায়স্থগণ অপেক্ষা হীন নহেন। বাঙ্গালার কুলীন্ কায়স্থেরা বিবিধ গুণের অধিকারী হইয়া যেমন বল্লাল সেন হইতে পদমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন, আসামের কায়স্থেরাও তদ্রূপ কোচ ও আহোমবংশীয় রাজগণ হইতে তাহা লাভ করিয়াছিলেন। যে দেশে বল্লালী কৌলিন্য-প্রথা নাই, সে দেশের কায়স্থেরা যে হীন হইবে তাহার কোন কারণ নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা কি বঙ্গদেশীয় কুলীন কায়স্থগণ অপেক্ষা হীন হইতে পারেন? আমাদের মতে, আসাম, বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিশুদ্ধ বিভিন্ন কায়স্থগণ পদমর্য্যাদায় পরস্পর সমতুল্য।

কেবল কামরূপ বা আসাম বলিয়া নয়, অধুনা ভারতের সকল

দেশের সকল কায়স্থ-সমাজে অল্লাধিকরূপে জাতীয়ত্বের বিশুদ্ধতা লোপ পাইতেছে। যেখানে নরনারীদিগের সামাজিক আচার-ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী না হইয়া নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে, সেখানে জাতীয় বিশুদ্ধতায় সংশয় উপস্থিত হয়। তাদৃশ সংশয়-স্থলে একমাত্র বৈদিক কর্ম্মাদির দ্বারা জাতীয় ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার নিয়ম পূর্ব্ব হইতে সকল দেশের হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। বিশুদ্ধ অসমীয়া কায়স্থ-সমাজে এখনও তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই'।

আসামে ব্রাহ্মণের পর কায়স্থের সামাজিক স্থান; কিন্তু বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের পর কায়স্থের মতান্তরে বৈদ্যজাতির স্থান। আসামে কায়স্থদিগের বীরত্ব ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্য সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী হইতেছে—"বামুণে চুহা হুঁকা কাইঠে লুটা গাঁও" অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ হুঁকায় করিয়া যে তামাক খান, তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়—অন্যের জন্য কিছু থাকে না। কায়স্থেরা যে গ্রামে বাস করেন, সেখানকার গ্রামবাসীদিগের কিছুই থাকে না, কারণ কায়স্থেরা সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লন। আর একটী হইতেছে—"কোচ ভেলেকা সালে ছেলেকা কলিতার ঘন ঘন গাঠি; হাজার কি বামুণ পণ্ডিত নহওক কাইথর আগত নাতি" অর্থাৎ—কোচ জাতির লোকগণ জড়ভরতের মত, সালে জাতির লোকেরা যেখানে পায় সেখানে খায়, কলিতা জাতির লোকগণ হৃষ্টপুষ্ট ও কাজকর্ম্মে মজবুদ। ব্রাহ্মণ যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, কায়স্থের সম্মুখে তিনি নাতির মত—অর্থাৎ কায়স্থের উপর টেক্কা মারিয়া (উচাইয়া) যাইবার উপায় নাই। বঙ্গদেশের কায়স্থ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে, "কায়েতের গুঁড়ো, বেদের বুড়ো" অর্থাৎ—বেদে জাতীয় লোকেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান। কিন্তু অল্পবয়স্ক কায়স্থ সন্তানের নিকট তাহাদের চালাকি খাটে না।

অসমীয়া কায়স্থ ভুঞাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণের

রাজত্বকালে রাষ্ট্রবিপ্লবহেতু কনৌজ হইতে কামতাপুরে আসিয়াছিলেন। গৌহাটী হইতে শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বীরহরি দত্ত বড়ুয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কায়স্থভাস্কর" নামক পুস্তিকাতে ঐ ভূঞা-দিগের সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। যাহা হউক—উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের কায়স্থ মহন্তরা এবং নিম্ন-আসামের বিশুদ্ধ কায়স্থেরা হলভার বহন করেন না (১৯২৪ সাল)। ইঁহাদের মধ্যে কেহ এরূপ করিলে জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। উজনীয়া অঞ্চলের 'কাথ মহাজন' ব্যতীত আর যাঁহারা আপনাদিগকে 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় দেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা 'কলিতা' হইয়া গিয়াছেন। উপর-আসামের লখিমপুর জেলায় বিশুদ্ধ অসমীয়া কায়স্থ আছে কি না সন্দেহ। আমরা সবিশেষ অবগত আছি যে, সেখানে কায়স্থ ও কলিতায় মেশামেশি—উভয়েই যেন একই জাতি।

পূর্ব্বোক্ত চণ্ডীবরের সহিত পাঁচজন কায়স্থ কামতাপুরে আসিবার পর ভূঞা (ভৌমিক) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীবরের বংশধর ৺শঙ্করদেব অসমীয়া বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মগুরু হওয়ায় অনেকে তাঁহার জীবনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। আসামের বহু কায়স্থ উল্লিখিত ছয়জন কায়স্থের বংশধর। তাঁহাদের কাহারও কাহারও কুলপঞ্জীতে স্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ আছে। কয়েকজনের পুরুষীনামা (কুলজী) গৃহদাহে ও ভূমিকম্পের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় গত ১৯১৩ সালে যখন গৌহাটীতে আসিয়া অসমীয়া কায়স্থ-দিগের পুরুষীনামা চাহিয়াছিলেন, তখন অনেকেই উক্ত ছয়জনকে মূল পুরুষ ধরিয়া তাঁহার নিকট জাল পুরুষীনামা দাখিল করিয়াছিলেন। "কায়স্থ পত্রিকা" বাহির হওয়াতে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। কয়েকজন প্রকৃত কুলজীই দিয়াছিলেন। উক্ত ভূঞা কয়জনের বংশধর না হইলে যে কাহারও বংশ-গৌরবের লাঘব হইবে, তাহার কোন অর্থ

নাই। ঐ ছয়জন ভূঞা অপেক্ষা অন্যান্য ভূঞাকে আমরা অধিক ক্ষমতাশালী দেখিতে পাই। ভূঞাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী হইতেন, তাঁহাকে "শিরোমণি ভূঞা" বলা হইত।

নিম্ন-আসামের আধুনিক অসমীয়া কায়স্থদিগের চালচলন ও ব্যবহার কিরূপ তাহা অবগত হইবার জন্য গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, দমকা-চকাবাউসীর মৌজাদার ও 'অনারারী' ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব রজনীকান্ত চৌধুরী, খাতাবাড়ীর মৌজাদার শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী, ধর্ম্মপুর মৌজার মৌজাদার শ্রীযুত রণীধর চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সঙ্গতিহীন 'খাতি' কায়স্থের সংস্পর্শে আসিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা সময়মত 'আসাম ভ্রমণ' পুস্তকে বিবৃত করিব। অসমীয়া কায়স্থদিগের 'সামাজিক আচার' আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল :—

১। খাতি কায়স্থ

উপনয়ন ও পুংসবন ব্যতীত ইঁহাদের যাবতীয় সংস্কার ব্রাহ্মণদিগেরই মত। কন্যা পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকন্যার মত বিবাহ দিতেই হইবে—অন্যথা ইঁহারা জাতিচ্যুত হন। অন্যান্য জাতির মহিলাদিগের ন্যায় ইঁহাদের পত্নীগণ বাটীর বাহিরে—লোকসাধারণের দৃষ্টিপথে—কখনও আসেন না। কেবল অন্দরমহলে একঘেয়ে (monotonous) জীবন (১৭) যাপন করেন।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর কায়স্থ

ইঁহাদের আদিপুরুষ খাতি (বিশুদ্ধ) কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে

(১৭) যে সংসারে স্ত্রীলোকের মনে শান্তি নাই, সে সংসার ছারখারে যায়। সুখ-দুঃখ বোধ পুরুষ যেমন করিতে পারে, স্ত্রীলোকও তদ্রূপ করিতে পারে। আমরা কিন্তু আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী।

ইঁহারা সংস্কারহীন হইয়া অথবা যাবতীয় সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া কলিতা ও কেওট জাতির সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, এবং কন্যা বড় হইয়া ঋতুমতী হইলে তাহাদিগের বিবাহ দিয়া থাকেন—অথচ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, কখন কলিতা বা কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেন না। আমাদের মতে ইঁহারাই "দ্বিতীয় শ্রেণীর কায়স্থ"। উত্তর গৌহাটীর কায়স্থগণ একণে দ্বিতীয় শ্রেণীর কায়স্থ।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর কায়স্থ

অবস্থা উন্নত হইলে, লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইলে যাঁহারা আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা "তৃতীয় শ্রেণীর কায়স্থ" নামে অভিহিত করিতেছি। খাতি কায়স্থগণ ইঁহাদিগকে "ধুতি ছোলা পিন্ধিয়া কায়স্থ" বলেন। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে তৃতীয় শ্রেণীর কায়স্থের অভাব নাই।

মঙ্গলদৈ মহকুমায় বর্ত্তমানে মাত্র নয় ঘর বিশুদ্ধ কায়স্থ বসবাস করিতেছেন, যথা—ছপাই মৌজায় শ্রীযুত আনন্দিরাম চৌধারি ও শ্রীযুত চন্দ্রমল চৌধুরী, ডাঁহী মৌজায় শ্রীযুত ছমকরাম বড়ুয়া, শ্রীযুত জয়রাম বড়ুয়া, শ্রীযুত হিন্দুরাম বড়ুয়া, হলিরাম বড়ুয়া, মহতরাম বড়ুয়া ও শ্রীযুত হেমকান্ত বড়ুয়া এবং ডিপিলা মৌজায় শ্রীযুত ঘনকান্ত মহন্ত। উক্ত শ্রীযুত আনন্দিরাম সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভূঞার বংশধর। শ্রীযুত চন্দ্রমলের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ কামরূপের কেন্দুকুচি হইতে এবং শ্রীযুত হিন্দুরামের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ নন্দগ্রাম হইতে কতকগুলি কারণে মঙ্গলদৈ অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করেন। যাহাহউক—মঙ্গলদৈ অঞ্চলের ঐ নয় ঘর বিশুদ্ধ কায়স্থ এবং কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার বিশুদ্ধ কায়স্থগণ—সংখ্যায় অল্প হইলেও—জাতীয় বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এখনও তাঁহারা কলিতা সমাজে প্রবেশ করিয়া পতিত হন নাই এবং ভবিষ্যতে যাহাতে পতিত না হন, তজ্জন্য ১৩১৪ বঙ্গাব্দে

মাখিবাঁহার শ্রীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, ৺স্বরূপনাথ বড়ুয়া, শ্রীযুত যজ্ঞনারায়ণ মজুমদার, শ্রীযুত বীহুরাম মজুমদার, শ্রীযুত নবীননারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুত বীরহরি দত্ত বড়ুয়া, রায় সাহেব রজনীকান্ত চৌধুরী, ও অন্যান্য স্থানের জনকয়েক ব্যক্তি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া গৌহাটীতে সর্ব্বপ্রথম "আর্য্য কায়স্থ সভা" নাম দিয়া এক সভা গঠন করেন।

কনৌজাগত খাতি কায়স্থগণের যে কয়েকজন বংশধরের গুণগ্রামের ফলে অসমীয়া সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে; তন্মধ্যে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও তদীয় শিষ্য মাধবদেবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র আসামের খাতি কায়স্থগণ কলিতাদি জাতির লোকদিগের ন্যায় কখনও বিধবা বিবাহ করেন না, কিংবা তাঁহাদিগের কন্যাগণকে দ্বিতীয়-সংস্কারের পূর্ব্বে বিবাহ দেন না। উপনয়ন ও পুংসবন ব্যতীত অসমীয়া খাতি কায়স্থদিগের যাবতীয় সংস্কার ব্রাহ্মণদিগেরই মত। উজনীয়া অঞ্চলের কায়স্থ মহন্তদিগের সহিত ভাটী অঞ্চলের বিশুদ্ধ কায়স্থদিগেরও বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। উপর-আসামে ও মধ্য-আসামে যে কয়েক ঘর খাতি কায়স্থ আছেন, তাঁহাদিগের সহিত নিম্ন-আসামের বিশুদ্ধ কায়স্থদিগের সামাজিক আচারের কোন পার্থক্য নাই। তাঁহাদিগের সহিত অন্যান্য (সাধারণ) কায়স্থগণের আচার-ব্যবহারের তুলনা করিলে বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অসমীয়া বিশুদ্ধ কায়স্থদিগের আর্থিক অবস্থা যতই হীন হউক না কেন, তাঁহারা কাহারও নিকট—এমন কি স্বজাতির বাটীতেও—ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হন না। কোন জাতির গৃহে আহারান্তে খাতি কায়স্থকে বাসন-কোসন পরিষ্কৃত করিতে বলিবার নিয়ম নাই; চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। কলিতাদি শূদ্রের গৃহে কোন কায়স্থ জলযোগ কিংবা রন্ধনপূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ করিলে ঐ শূদ্রেরা তাঁহার বাসন পরিষ্কার করিয়া লইয়া থাকেন, কিন্তু কলিতাদি

শূদ্রেরা কায়স্থের গৃহে ভোজন করিলে তাঁহারা নিজেই বাসন-কোসন পরিষ্কার করিয়া যান। তবে যদি কোন কলিতা ভদ্রলোক কোন কায়স্থের গৃহে আহার করেন, ঐ কাজ করা তাঁহার পক্ষে প্রথা-বিরুদ্ধ। ঐ ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া চাকর আনিলে, সে তাঁহার বাসন-কোসন পরিষ্কার করিয়া দেয়; নতুবা গৃহস্বামী তাঁহার চাকর দ্বারা বাসন-কোসন মাজাইয়া লন। কলিতাদি যাবতীয় শূদ্রের কায়স্থের পাকান্ন গ্রহণ করিবার প্রথা আছে (১৯২০)। অধুনা কলিতাদিগের মধ্যে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রমাণিত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। বিগত ১৯২৪ সালে আমরা কামরূপের বহু 'খাতি' কায়স্থকে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত কি না তৎসম্বন্ধে পশ্চিম-বঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার প্রভৃতির সহিত ভূপতি বাবু ও গীষ্পতি বাবুর যে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিতেছে, তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সমাজে যেভাবে চলিতেছি, সেই ভাবেই চলিব।" অসমীয়া খাতি কায়স্থগণ পূর্ব্ব হইতে সদাচারী ও সৎসাহসী থাকায়, বিগত ১৯১৩ সালে গৌহাটীর প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় রামদাস ব্রহ্মের সহায়তায় আসাম ভ্রমণকালে আমরা গ্রাম্য কলিতা-গণকে বিশুদ্ধ কায়স্থদিগের প্রতি পূজ্যপাদ ব্যক্তির মত মান্য করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা খাতি কায়স্থদিগের হুঁকায় তামাক খাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। আমরা জানি—কষ্টে পড়িলে বৈশ্য ও কৈবর্ত্ত জাতির মত কলিতারাও কায়স্থের গৃহে কাজ-কর্ম্ম করে।

অসমীয়া কায়স্থেরা বল্লালী নিয়মের অধীন নহেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলিন্য-প্রথা নাই। ঘোষ, বসু, মিত্র, দাস, দে, সিংহ প্রভৃতি তাঁহাদের কোন বিশেষ উপাধিও নাই। অনেক অসমীয়া

কায়স্থ আহোমরাজ-প্রদত্ত বড়ুয়া, চৌধারী, মজুমদার প্রভৃতি উপাধি লিখিয়া থাকেন। এই সকল উপাধি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতাদি জাতির মধ্যেও আছে। একারণ কেবল উপাধি শুনিয়া কোন অসমীয়ার জাতি নির্ণয় করা যায় না। বসু, দত্ত ও গুহ বংশীয় বহু কায়স্থ আসামে আসিয়া পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদিগের কৌলিক উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আহোমরাজ প্রদত্ত উপাধি দ্বারা আপনাদিগকে পরিচয় দিতেছেন। আমরা এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিব—শিবসাগরের রায় বাহাদুর কনকলাল বড়ুয়ার ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ বিশুদ্ধ বসু-বংশীয় ছিলেন। তাঁহার বংশ-ধরগণ কি কারণে বসু উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়ুয়া উপাধি দ্বারা পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। যাহাহউক—উক্ত রায় বাহাদুর গৌহাটীতে বর্ত্তমানে বসবাস করিলেও কামরূপের বিশুদ্ধ কায়স্থ সমাজভুক্ত নহেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু গৌহাটীতে আসিয়া তাঁহার কুলজী পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আপার আসামবাসী কোন ব্যক্তির 'দত্ত' উপাধি দেখিয়া সহসা তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করা যায় না। কারণ সেখানকার কোন কোন কলিতা জাতীয় ব্যক্তির 'দত্ত' উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। আপার-আসামের অনেক শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি লেখাপড়া শিখিয়াই নামের শেষে দত্ত লিখিয়া আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের কোন ব্যক্তির দত্ত উপাধি দেখিয়া তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করা যায়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, প্রায় ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে শান্তিপুর নিবাসী গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের জনৈক পণ্ডিত মহাশয় অসমীয়া কায়স্থ-পুত্রদিগকে 'দত্ত' উপাধি লেখাইতে আরম্ভ করেন। তখন হইতে কায়স্থ জাতীয় তদীয় ছাত্রেরা তাঁহাদের নামের শেষে 'দত্ত' উপাধি লিখিতে থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত চণ্ডীবর, শ্রীধর, শ্রীহরি প্রভৃতি ভূঞাগণের সময়ে কামরূপে

বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে একপ্রকার ধর্ম্ম ও ঘোর তান্ত্রিকতার প্রাবল্য হেতু সে অঞ্চল মদ্য, মাংস আদি পঞ্চমকারের লীলানিকেতন ছিল। কনৌজাগত এই কায়স্থ ভূঞাগণ ও আর সাতঘর ব্রাহ্মণ ভূঞারা পূর্ব্ব হইতে শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শঙ্করদেব ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত হইয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিলে পর, ব্রাহ্মণ ভূঞার বংশধর দামোদর দেব ও হরিদেব তাঁহার আদর্শ অনুকরণ করেন। "কি প্রকারে সাত্বিক ভগবৎ উপাসনা করিতে হয়" মহাপুরুষ শঙ্করদেবের পূর্ব্বে কামরূপের কোন জাতির লোকেরা তাহা জানিতেন না। শঙ্করদেব "কীর্ত্তন ঘোষা" এবং মাধবদেব "নাম ঘোষা" রচনা করিয়া আপামর জাতির লোককেও বিশুদ্ধ ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতি শিক্ষাদান করেন। এই কায়স্থ শঙ্কর এরূপ উদার মতাবলম্বী ছিলেন যে, তিনি জাতি বিচার না করিয়া কলিতা, কেওট, সালে, নদীয়াল প্রভৃতি জাতির লোককে শিষ্য ভজাইবার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে "মেধি" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহারই উদারতার ফলে কোচ ও সাউ জাতির লোকেরা জল আচরণীয় হন।

যখন আমরা কোন বিষয়ের ইতিহাস লিখিতেছি, তখন আর "মা ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্" নীতি ভাবিয়া সত্যের অপলাপ করিলে কে না আমাদিগকে দোষারোপ করিবে? দোষারোপ করুন আর নাই করুন, কেহ মনক্ষুণ্ণ হউন বা না হউন, আমরা সেদিকে লক্ষ্য করিব না। কেননা—ইতিহাসের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির গাঁথুনিতে যদি কোন দোষ থাকে, কেহ তাহা দেখাইয়া দিলে অবনত মস্তকে আমরা তাহার সংস্কারসাধন করিব। কিন্তু "অসমীয়া সভ্যতার মূলেই কায়স্থ শঙ্করদেব" আমাদের এই উক্তি ধ্রুব সত্য। তাই বলিতেছি—আসামে খ্যাতি কায়স্থের গৌরব সূর্য্যস্বরূপ, ব্রাহ্মণের গৌরব চন্দ্র-

কায়স্থ শঙ্করদেব ও অসমীয়া সভ্যতা

স্বরূপ। কনৌজাগত খ্যাতি কায়স্থ চণ্ডীবরের পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের কথা বারান্তরে আমরা বলিব। তদীয় বংশাবতংস শঙ্করদেবের অলৌকিক ধর্ম্মমাহাত্ম্য ও সাহিত্য-প্রতিভার ফলেই অসমীয়া হিন্দুদিগের কুসংস্কার তিরোহিত, তাঁহাদের সমাজ সংস্কৃত ও সাহিত্য বাঙ্গালা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, ইহা আমরা দেখিতে পাই। কি অসমীয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি অসমীয়া সাহিত্যক্ষেত্রে কায়স্থ শঙ্করের গৌরবাতিশয্য হেতু একদল অ-মহাপুরুষীয়া ব্রাহ্মণ তদীয় গৌরব বিলোপনের চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল।

অসমীয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের হিমগিরি আসাম-গৌরব শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া মহোদয় উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র সবিশেষ আলোচনান্তে কত বার তাঁহাদিগকে শঙ্করবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কতবার বলিয়াছেন, "তোমরা ইতিহাস ও শাস্ত্রের দিক্ দিয়া প্রমাণ দাও—তোমরা শঙ্করদেবের নিকট ঋণী আছ কি না? সত্যের অপলাপ দ্বারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না।" যখন এই মনস্বী ও তেজস্বী ব্যক্তি দেখিলেন, তাঁহার এই হিতোপদেশ 'উলুবনে মুক্তা-ছড়ান'র মত হইল, তখন তিনি 'বাঁহী' পত্রিকার মারফতে সাদরে তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বামুনীয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জনকয়েক যাঁহারা রণক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন, শ্রদ্ধেয় বেজবড়ুয়ার জ্বালাময়ী লেখনী প্রভাবে অনতিকালমধ্যে তাঁহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরা কতই হাসিলেন। বেজবড়ুয়া মহোদয়ের প্রশংসা-ধ্বনিতে আসাম-গগন মুখরিত হইল।

বহুকাল গবেষণার পর আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শঙ্কর-বিদ্বেষী বামুনীয়াদলকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "এই কায়স্থ শঙ্করের গৌরব ও প্রতিভা বাদ দিলে এতদিনেও অসমীয়া সভ্যতা (civilisation)র কতদূর উন্মেষ হইত, তাহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন?"

প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে ঈর্ষ্যানলে কথনই তাঁহাদের গাত্রদাহ হইত না। কিন্তু তাঁহাদের সে বিচারশক্তি কই? আমাদের মনে হয়—সেখানকার হিন্দু-ইতর জাতির লোকেরা অদ্যাবধি যে তিমিরে নিমজ্জিত, তাঁহাদেরও তদ্রূপ দশা হইত। পঞ্জাব যেমন নানকের আবির্ভাবে, মান্দ্রাজ যেমন রামানুজের অভ্যুদয়ে গৌরবান্বিত, আসামে তেমনি মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জন্মগ্রহণ করায়, কে না স্বীকার করিবে—'অসমীয়াদিগের গৌরব বৃদ্ধি' পাইয়াছে?' অসমীয়া সভ্যতার বিকাশই যে এই কায়স্থ শঙ্কর হইতে—কোন্ অসমীয়া না একথা বলিবে?

অ-মহাপুরুষীয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণের মহাদুঃখ—'অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ও অসমীয়া সাহিত্যের মূলে কায়স্থ শঙ্কর থাকায় আসামে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থের গৌরব করিবার দাবি অধিক।' ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু হইয়া কেমন করিয়া ইহা সহ্য করিবেন? একারণ কায়স্থ-ভাস্কর শঙ্করের গৌরব লাঘব করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা চেষ্টিত। উক্ত ব্রাহ্মণেরা শঙ্করদেব ও কায়স্থ কুলপ্রদীপ তদীয় শিষ্য মাধবদেবকে মুখে না মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা এই মহাপুরুষদ্বয়ের নিকট ঋণী। কেননা—আমরা দেখিতে পাই, "আসামে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত মহাপুরুষীয়া, দামোদরীয়া, গোপালদেবী ও হরিদেবী সম্প্রদায়ের লোকেরা সংকীর্ত্তনকালে, উপাসনার সময়, হরিমন্দিরে, শ্রাদ্ধবাসরে অথবা অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মের সময়, শঙ্করদেব ও মাধবদেব রচিত গীত, পদ আবৃত্তি ও পুঁথিপাঠ করিয়া থাকেন। সাধারণ অসমীয়া হিন্দুরা মুক্তির উদ্দেশে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, সেগুলিও শঙ্করদেব ও মাধবদেব বিরচিত। বামুনীয়া সম্প্রদায়ের 'কথা ভাগবত' কথা গীতা ও 'ঘোষা রত্ন' ব্যতীত আর যে কয়েকখানি পুঁথি আছে, সেগুলি কাহারও কাহারও মনঃপূত না হওয়ায় ক্রমশঃ Dead languageএর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহার মন্দীভূত হইতেছে।"

শ্রদ্ধেয় বেজবরুয়া মহোদয় তাঁহার 'বাঁহী'তে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "শঙ্কৰদেৱেই বামুনৰ সৰ্ব্বস্ব তথাপি তেওঁক শূদ্ৰিৰ বোলা" অর্থাৎ— "শঙ্করদেবই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব তথাপি তাঁহাকে শূদ্র বল! যাঁহাদের ঋষিতুল্য পূর্ব্বপুরুষ (জহ্নুমুনি) গণ্ডুষে গঙ্গা উদরস্থ করিয়াছিলেন (১৮) তাঁহারা আচারভ্রষ্ট, সংস্কারহীন অথবা যাহাই হউন না কেন, বংশ-পরম্পরাগত এবংবিধ বাচনিক উক্তি যতদিন না বিলুপ্ত হয়, তদবধি self-important বা 'গ্রামে মানে না আপনি মোড়ল' হইতে না দিলে তিনি যে তাঁহাদের চক্ষুশূল হইবেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

উপসংহার

সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে অল্প-বিস্তর জনপ্রবাদ আছে। ইহা প্রচলিত থাকায় এই উপকার হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা বহু প্রাচীন অথবা বিলুপ্ত বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ৭২ পৃষ্ঠায় আমরা প্রসঙ্গক্রমে কোচ ভেলেকা সালে ছেলেকা......এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু উহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; কারণ শিবসাগর জেলার কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমাদের পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, ঐ কিম্বদন্তীটী বোধ হয় এইরূপ হইবে :—"কোচ ভেলেকা, গালে চেলেকা, কলিতাৰ ঘন ঘন গাঁঠি। যিমান কি বামুন পণ্ডিত নহওক, কায়স্থৰ আগত নাতি॥ অর্থাৎ—ভেলেকা (not shrewd), তাহারা কেবল গালের উপর চাটে i.e. they cannot go deep into the matter. কলিতা জাতির লোকেরা crooked, তাঁহাদের কথায় আর কাজে গাঁট (nuts) very close and many." নিম্ন-আসামের

(১৮) আধুনিক আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় ডি, এল, রায় লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ বলে নোয়ায় না মাথা কে আছে এমন হিন্দু? আমাদের এক পূর্ব্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।"

জনৈক ভদ্রলোককে পত্রের দ্বারা এই প্রবাদটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "শালে সেলেকা কোচ ভেলেকা কলিতাব ঘন ঘন গাঠি। চৈদ্দ শাস্ত্রত বামুন পণ্ডিত তেওঁ কায়থক নাটি॥ অর্থাৎ —শালে জাতীয় লোকগুলি সেলেকা (ছেলেকা নহে) অর্থাৎ slack, কোচেরা ভেলেকা অর্থাৎ 'হাবারাম' simple—কলিতারা বড় জেদ্দি, তাঁহাদের গাঠি (গেঁটে) বড়ই ঘন অর্থাৎ তাঁহারা সহজে কোন বিষয়ে হার মানিতে চান না। যদিও ব্রাহ্মণ চৌদ্দ শাস্ত্রে পণ্ডিত তথাচ কায়স্থকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না—'অন্যেষাং কা কথা।' যাহা হউক—আমরা যাহা অবগত হইয়াছি, কেবল তাহাই উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলাম।

৭৬ পৃষ্ঠায় আমরা আর্য্য কায়স্থ সভার উল্লেখ করিয়াছি। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, ৺সরুনাথ বড়ুয়া, শ্রীযুত বীরহরি দত্ত বড়ুয়া প্রভৃতি খ্যাতি কায়স্থ গৌহাটীতে তাঁহাদিগের জাতীয় সভা গঠনের জন্য চেষ্টিত হইলে খাতাবাড়ীর মৌজাদার শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী তদীয় নলবাড়ীস্থ বাটীতে সর্ব্বপ্রথম এক সভা আহুত করেন। ৺গঙ্গারাম পাটোয়ারী উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। অতঃপর আর্য্য কায়স্থ সভা গঠিত হইলে উক্ত বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে মাখিবাঁহা গ্রামে শ্রীযুত বলীনারায়ণ চৌধুরীর বাটীতে উক্ত সভার একটী বৃহৎ (দ্বিতীয়) অধিবেশন বসে। উহাতে নিয়মাবলী ও কার্য্যাবলী আলোচিত হওয়ার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। চামটা নিবাসী মৌজাদার শ্রীযুত রণীধর চৌধুরী এবং স্বর্গীয় অরুণচন্দ্র রায় চৌধুরী উহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। গৌরিপুরের রাজা বাহাদুর তাঁহাদের এই জাতীয় সাধু প্রচেষ্টায় প্রীত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সদুপদেশ দিয়াছিলেন।

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মাধবদেব

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত ধরলা বা ধর্লা নদীতটস্থ 'বাণ্ডুকা' গ্রামে গোবিন্দ গিরি নামক জনৈক তান্ত্রিক-অনুষ্ঠান-পরায়ণ কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহার কর্ণ দীর্ঘ থাকায় লোকে তাঁহাকে "বরকণা, দীঘল কণা, কাণলমা" নামেও ডাকিত। দৈত্যারি ঠাকুর-রচিত পুঁথিতে উল্লেখ আছে, "নিজ তান নাম গোবিন্দ জানিবা, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত; কাণ লম্বা দেখি আসামে দিলেক তান কাণলমা নাম।" আধুনিক বৈষ্ণব ইতিহাসে ডাকনাম দ্বারাই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হয়। যাহাহউক—গোবিন্দ গিরির জনৈক পূর্ব্বপুরুষ কনৌজ হইতে সর্ব্বপ্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন। এই গোবিন্দের পুত্র মহাপুরুষ মাধবদেব অসমীয়া বৈষ্ণব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

গোবিন্দ গিরি

প্রিয়তমা পত্নী 'অনুচিতা' অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গোবিন্দ গিরি প্রাণে শেলসম আঘাত অনুভব করিতে লাগিলেন। বিষয়-বৈভব, আত্মীয়-স্বজনের সমাগম ক্রমে তাঁহার বিষময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর সংসারে তিষ্টিতে না পারিয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া ঘটনাক্রমে আধুনিক নগাঁও জেলার অন্তর্গত বরদোয়া গ্রামে আসিয়া পড়েন। গোবিন্দ গিরি সেখানে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্রতী হন।

বরদোয়া হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে স্বদেশে যাতায়াত করিতেন। বাণ্ডুকা তৎকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিছুকাল পরে কামরূপে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিলে তিনি প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়া আধুনিক উত্তর-লখিমপুর মহকুমার অন্তর্গত নারায়ণপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর অরাজকতা প্রশমিত হইল। কিছুদিন পরে আহোম

ও কাছাড়ীরা আবার দেশের নানাস্থানে অমানুষিক উপদ্রব আরম্ভ করিল। গ্রামবাসীরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন।

মাধবদেবের জন্ম

গোবিন্দও সেখান হইতে পলায়নপূর্ব্বক নারায়ণপুরের নিকটবর্ত্তী 'লেটেকুপুকুরী' নামক স্থানে হরশিঙ্গা বরার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোবিন্দর এখানে অবস্থানকালে ১৪১১ শকের জ্যৈষ্ঠ-মাসে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তৎপুত্র মাধবদেব জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শঙ্করদেব-মাধবদেব চরিত (গুরু চরিত) লেখক দ্বিজ রামানন্দ বলেন, গোবিন্দ যখন নারায়ণপুর হইতে বালি গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন তৎকালে মাধবদেবের জন্ম হয়:—

* * * *

বঞ্চিলন্ত গৈয়া পাছে নাবায়ণপুরত ॥
বাসা কবি বৈলা পাছে বালি যে গ্রামত।
জন্মিলা মাধবদেব সেই সময়ত ॥ ৩৭১
শুক্ল নবমীতে জানা বৈশাল মাহত।
দিবাভাবে জান্মিলন্ত দুই প্রহবত ॥—গুরু চরিত্র।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমানে বালি গ্রাম নারায়ণপুর মৌজার অন্তর্গত।

শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাদের জীবনী সম্পর্কে কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজের সময় হইতে কয়েকজন ভক্ত তাঁহাদের চরিত পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং যিনি যেমন শুনিয়াছেন তিনি সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহাহউক— মাধবদেবের জন্মগ্রহণের কয়েক বৎসর পরে গোবিন্দ গিরির আর একটী কন্যা হয়। এই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে তিনি যশোপাল ভূঞার পুত্র গয়াপাণিকে সম্প্রদান করেন।

মাধবদেব তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মত প্রথমে শাক্তধর্ম্মে অত্যন্ত

আস্থাবান ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহার জননীর কঠিন পীড়া হইলে তিনি তাঁহার আরোগ্য লাভের জন্য দেবীর নিকট এক জোড়া পাঁঠা মানসিক করেন। তাঁহার মাতা কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিলে তিনি ভগ্নীপতি গয়াপাণিকে বলিলেন, "দেবী মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। আমাকে এক জোড়া ছাগ আনিয়া দাও, তাঁহার নিকট বলি দিবার মানসিক আছে।"

মাধবের পাঁঠা মানসিক

গয়াপাণি (১৯) ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্করদেবের নিকট 'এক শরণ ধর্ম্মে' দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। মাধবদেব ইহা জানিতেন না। তিনি মাধবকে বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে, যে ছাগ বলি দেয়, পরজন্মে সে ছাগ হয়, আর ছাগ মানুষ হইয়া তাহাকে বলি দিয়া থাকে।" মাধবদেব ইহা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তুমি আমাকে শাস্ত্র শিখাইতে চাও?" তদুত্তরে গয়াপাণি বলিলেন, "যখন তুমি না বুঝিয়া চটিয়া উঠিলে তখন তোমাকে অধিক কথা বলিতে চাই না, কিন্তু যদি তুমি শঙ্করদেবের নিকট যাইতে তোমার অন্ধবিশ্বাস থাকিত না।" মাধবদেবের শাস্ত্রচর্চ্চা অল্প ছিল না। তিনি গয়াপাণিকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "শঙ্করদেব আমাকে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইবেন! ভাল কথা, আমাকে তাঁহার সন্নিধানে লইয়া চল।"

গয়াপাণির উপদেশ

পরদিন প্রত্যুষে (প্রায় ১৫২২ খ্রীঃ অব্দে) গয়াপাণি তাঁহাকে শঙ্করদেবের নিকট ধুঞাহাটা (বেলগুরি)য় লইয়া গিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। ইতিমধ্যে পথে আসিতে আসিতে মাধবদেব গয়াপাণিকে বলিলেন, "শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্কে যদি আমি তোমার শঙ্করদেবের নিকট

শঙ্কর-মাধবে বাদানুবাদ

(১৯) গয়াপাণি—ইনি মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পর গয়াপাণি 'রামদাস' নামে পরিচিত হন। ইঁহার পুত্রের নাম রামচরণ। এই রামচরণের পুত্র 'দৈত্যারি ঠাকুর' শঙ্করদেব ও মাধবদেবের চরিত পুঁথি লিখিয়াছেন।

পরাজিত হই, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিব, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আর ছাগ বলি দিব না।" ধুঞাহাটায় শঙ্কর-দেবের সহিত মাধবের প্রথমে বলিদান, তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্মবিষয় লইয়া বহুক্ষণ বহু তর্কবিতর্ক হইল। মাধবদেব আত্মমত সমর্থনের জন্য তন্ত্র ও পুরাণ হইতে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করত প্রয়োগ করিলেন, শঙ্করদেব শাস্ত্রীয় যুক্তিসহ অল্প কথায় সেগুলি খণ্ডন করিয়া দিলেন। মাধবদেব কুতার্কিক ছিলেন না। শঙ্কর-দেবের সহিত বিচারকালে তাঁহার হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত ও মস্তক অবনত হইয়া আসিতেছিল। বলিদানের অসারতা ও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণের সারতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবামাত্র তিনি ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে আত্মসমর্পণ করি-লেন। কথিত আছে—সমগ্র পুরাণের উপর মাধবদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য স্বীকার করিলে পর শঙ্করদেব নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করেন :—

মাধবের আত্মসমর্পণ

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথাচ সর্ব্বার্চ্চনমচ্যুতেজ্যা॥

শঙ্করদেবের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারের পর মাধবদেব প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনা করিতেন। যেদিন তিনি স্থানান্তরে গমন করিতেন, মাধবদেব সেই দিন তাঁহার টাকা পয়সার হিসাব রাখিতেন এবং তাঁহার ভোজন ও শয়ন সম্পর্কীত বিষয়ের আয়োজন করত তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন :—

মাধবের গুরুসেবা

বস্ত্র সলাই গৈয়া ঠাই মাধবে অতান্ত।
বজাবক গৈয়া বস্ত্র কিনিয়া আনন্ত॥
স্নান কবি শঙ্কবক ভোজন কবান্ত।
তৈল নিয়া তান দুই চৰণ জান্তন্ত॥

শঙ্কৰদেৱৰ নিদ্ৰা আসিলেক যেবে।
আদাথাৰ মাধৱে পাৰত নিয়া তেবে ॥
লাস কৰি নমাই থৈয়া দুখানি চৰণ।
তেবেসে আপুনি গৈয়া কৰন্ত ভোজন ॥
এইমতে সেৱা নিতে মাধৱে কৰন্ত।
আনলোকে ফাতফোন্ত ঘুমটি পাৰন্ত ॥—গুরুচরিত।

একদিন গুরুপত্নী কালিন্দী শঙ্করদেবকে বলিলেন, "মাধব প্রত্যহ দুপুরবেলা ভোজনের জন্য নিজ গৃহে যাইয়া থাকে। আজ তাহাকে আমাদের এখানে খাইতে বলুন। পরদিন যথা-

মাধবের নিমন্ত্রণ

সময়ে মাধব আসিয়া উপস্থিত হইলে শঙ্করদেব তাঁহাকে বলিলেন, "মাধব, তোমার গুরুপত্নী আজ এখানে ভাত খাইতে বলিয়াছে।" মাধব বলিলেন, "তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা, আমি কেন খাইব না? কিন্তু প্রভো! আমাকে রন্ধনগৃহটা একবার পরিদর্শন করিতে আদেশ দিউন।" শঙ্করদেব আদেশ দিলেন। মাধব পাক-শালার এক কোণে একটী গণেশমূর্ত্তি এবং পূজার

শঙ্কর-পত্নীর গণেশপূজা

দ্রব্যাদি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন, "মা! এ কি করিয়াছেন!" গুরুপত্নী বলিলেন, "আমার ছেলে-পিলে আছে, ওদের বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া আমি গণেশপূজা করি।" তদুত্তরে মাধবদেব বলিলেন, "আপনি আপনার স্বামীকে হাতে পাইয়াও চিনিলেন না। তিনি অন্য দেব-দেবীর পূজাপটল উঠাইয়া দিয়া কেবল 'নামধর্ম্ম' প্রচার করিতেছেন। হাজার হাজার লোক তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে; অথচ আপনি এরূপ মহাপুরুষের পত্নী হইয়াও কি ভীষণ কাজ করিতেছেন!" এই কথা শুনিয়া গুরুপত্নী অতিশয় বিচলিত হইয়া স্বামী-গুরু শঙ্করদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ

নিজ অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা চাহিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুরূপে বরণ করিয়া লইলেন। অতঃপর মাধবদেব গণেশমূর্ত্তি, ঘট-পট, পাকের হাঁড়ি সবই দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পুনরায় পাক-ঘর জলধৌত করিয়া মোছান হইল। গুরুপত্নী পুনরায় স্নান করিয়া নূতন হাঁড়িতে পাক করিলে পর মাধবদেব ভোজন করিলেন।

গুরুকন্যা রুক্মিণী অষ্টমবর্ষে পতিত হইলে তৎকালীন প্রথানুযায়ী বিবাহযোগ্যা হইলে, গুরুপত্নী শঙ্করকে বলিলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা কন্যাটীকে মাধবের সহিত বিবাহ দিই।" শঙ্করদেব বলিলেন, "সে তো উত্তম কথা, কিন্তু এবিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না, কারণ মাধব ইহাতে সম্মত হইবে বলিয়া তো মনে হয় না।" পরদিন মাধব আসিয়া উপস্থিত হইলে শঙ্করদেব বলিলেন, "মাধব আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি উহা করিতে রাজী হইবে তো?" মাধবদেব তাঁহার কথার ভাবে মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আপনি যে কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেটী করিতে বলিবেন না—আমি উহা পারিব না। সেটী ছাড়া আপনার আর সব আজ্ঞা পালন করিতে পারি।" তখন শঙ্করদেব বলিলেন, "গড় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল; শত্রু হইতে ভয় থাকে না।" তদুত্তরে মাধবদেব বলিলেন, "যে ব্যক্তি গড় বাঁধিয়া যুদ্ধ করে, তাহাকে রথী বলে; কিন্তু গড় না বাঁধিয়া যুদ্ধ করিলে তাহাকে মহারথী বলা হয়।" ইহা শুনিয়া শঙ্করদেব একটু বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার বলে এরূপ কথা বলিতেছ?" তদুত্তরে মাধবদেব বলিলেন, "বাপ! আপনার পদরেণুরই প্রসাদে। ও চরণের ভরসা ব্যতীত আমার অন্য বলবীর্য্য কিছুই নাই।" এই কথায় তিনি প্রীত ও প্রেমাপ্লুত হইয়া বলিলেন—'বড়ার পো' আগে যদি তোমাকে পাইতাম, তাহা হইলে আমি গৃহাশ্রমের মধ্যে

মাধবসহ রুক্মিণীর সম্বন্ধ-বার্ত্তা

যাইতাম না। তথাপি কিছু দিন পরে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। গুরুপত্নী কিন্তু তখনও মাধবের আশা ছাড়েন নাই। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে মাধবদেবের বাকী রহিল না। একদিন তিনি গুরুকন্যাকে গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া গুরুপত্নীর কাছে নামাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে গুরুপত্নী মাধব-দেবের আশা ছাড়িয়া দিলেন।

আহোমরাজের যথেচ্ছাচার

ধুঞাহাটে শঙ্করদেবের অবস্থানকালে আহোমরাজ চুহুমুঙ্গ (স্বর্গ-নারায়ণ) হাতী ধরিবার জন্য খেদা পাতিয়া ভূঞাদিগকে তাঁহা-দিগের লোকজনসহ গড় রক্ষা করিতে বলেন। রাজাজ্ঞায় শঙ্করদেবও এই কার্য্যে আদিষ্ট হন। তিনি মাধবদেব ও স্বীয় জামাতা হরিকে লইয়া গড় পাহারা দিতেছিলেন। শঙ্করদেব লোকজনসহ যে দিকে পাহারা দিতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিকের গড় ভাঙ্গিয়া হাতি পলায়ন করে। আহোমরাজ এই সংবাদে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শঙ্করদেবের সহিত ভূঞাদিগকে ধৃত করিবার জন্য কতকগুলি পাইক পাঠাইয়া দেয়। যাঁহারা সুবিধা পাইলেন, প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পাইকেরা শঙ্কর-দেবকে ধরিতে আসিলে তিনি এক লম্ফে একটী চৌদ্দহাত প্রস্থ গড়খাই পার হইয়া দ্রুতগতিতে 'কলং' নদীর তীরে আসিয়া উহাকে অতিক্রম-পূর্ব্বক 'কলাকাটা' হইয়া 'বরদোয়া'য় উপস্থিত হইলেন। পাইকেরা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। তাহারা তাঁহার শিষ্য মাধবকে ও জামাতা হরিকে ধরিয়া লইয়া গেল। রাজাজ্ঞায় হরির শিরশ্ছেদ হইল। মাধব-দেবের বেশভূষা সন্ন্যাসীর মত দেখিয়া এবং তাঁহার মৃত্যুতে এ সংসারে কেহ কাঁদিবার নাই ভাবিয়া আহোমরাজ তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করে। এই ঘটনার এক বৎসর পরে শঙ্করদেব

বরপেটায় আগমন

তাঁহাকে লইয়া চুণপোয়া (আধুনিক বরপেটা)

গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন। তৎকালে ঐ স্থান কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শঙ্করদেব চুণপোয়ার পর কুমারকুচি তৎপরে পাটবাউসী যান। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের অধিকাংশ পুঁথি এই পাটবাউসীতে লিখিত হইয়াছিল।

মাধবের হেড়ম্ব-যাত্রা

গুরুচরিত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হেড়ম্ব রাজ্যের (আধুনিক কাছাড় অঞ্চলের) রাজা শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিবার জন্য দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। রাজদূত পাটবাউসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে শঙ্করদেব মাধবদেবকে বলিলেন, "আমি নিজে সেখানে যাইতে পারিতেছি না। তুমি তোমার বন্ধুকে লইয়া সেখানে যাও।" ইহা শুনিয়া মাধবদেব বলিলেন, "আপনি আমার কোন্ বন্ধুকে লক্ষ্য করিতেছেন।" তখন শঙ্করদেব ঠাকুর আতা (নারায়ণ দাস)কে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি যে তোমার সাক্ষাৎ বন্ধু।" গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বনান্তর হেড়ম্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন। মাধবদেব ও ঠাকুর আতা রাজবাটীর সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ জনৈক বন্দীকে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। হেড়ম্বরাজকে বলিয়া তাঁহারা ঐ বন্দীকে মুক্তি দিলেন। অতঃপর মাধবকে রাজাকে একদিন উপবাস রাখিয়া পরদিন তাঁহাকে 'এক শরণধর্ম্ম' প্রদান করত ঠাকুর আতাসহ পাটবাউসীতে ফিরিলেন।

শঙ্করদেবের দেহত্যাগ

শঙ্করদেব কোচবিহারে যাইবার পূর্ব্বদিন গণককুচিতে মাধবদেবের বাসস্থানে আসিলেন। সেখানে তিনি ঐ দিন রাত্রিবাসও করিলেন। শঙ্করদেব তাঁহাকে ধর্ম্মমাল্য প্রদান করিয়া পরদিন পুত্র রামানন্দসহ নৌকায় উঠিয়া কোচবিহারে চলিলেন। তত্রস্থ কাকতকুটা নামক স্থানে ১৪৯০ শকাব্দের ভাদ্র মাসে

শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে অসমীয়া কায়স্থ-কুলপ্রদীপ মহাপুরুষ শঙ্করদেব বৈকুণ্ঠ গমন করেন। রামানন্দ তাঁহার শবদেহ দাহন করিলেন। অতঃপর তিনি কোচরাজ নরনারায়ণ প্রদত্ত নৌকায় করিয়া 'পাট-বাউসী'তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ভক্তগণ সেখানে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের প্রভু দেহত্যাগ-কালে আপনাকে কি বলিয়া গেলেন?" রামানন্দ বলিলেন, "তিনি মাধবকে তাহার প্রতিনিধি করিয়া গিয়াছেন এবং আমাকেও তাঁহার নিকট 'শরণ' লইতে বলিয়াছেন।" এই কথায় ভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আতা টাকা, বস্ত্র আনিয়া মাধবদেবের সম্মুখে রাখিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, "বড়ই সুসংবাদ শুনিলাম, আমাদের গুরু যাঁহাকে তাঁহার প্রতিনিধি এবং আপন পুত্রের গুরু করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লইলাম।"

অনন্তর মাধবদেব তদীয় প্রভুর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দামোদর দেব নিমন্ত্রণ পাইয়াও আসিলেন না। তিনি কেবল দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে দামোদরদেব উপস্থিত না হওয়ায় মাধবদেব তাঁহার নিকট ঠাকুর আতাকে পাঠাইলেন। দামোদরদেব তাঁহাকে বলিলেন, "মাধবদেব কৌশল করিয়া শঙ্কর গুরুর ধর্ম্মগদির অধিকারী হইয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার অপেক্ষা আমার দাবী অধিক; সুতরাং আমি কেন তাঁহার নিমন্ত্রণে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইব?" ঠাকুর আতার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে মাধবদেব তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ এক জোড়া কাপড় ও একটী অঙ্গুরী দিলেন। দামোদরদেব তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ঠাকুর আতা তাঁহার না আসিবার কারণ সেখানে শঙ্করপুত্র রামানন্দকে বলিলে তদুত্তরে তিনি দামোদর দেবকে বলিলেন, "আমার

দামোদর দেবের সম্বন্ধোচ্ছেদ

পিতা ও মাধব উভয়েই যেন এক আত্মা। আপনি যখন মাধবের সমকক্ষ বলিয়া এত গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে প্রথমে আসিলেন না, শেষে অনুরোধে পড়িয়া উপস্থিত হইয়া দক্ষিণা লইলেন, তখন আজ হইতে আপনার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।" এই কথায় দামোদর দেব প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন। ঐ দিন হইতে তিনি তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া নিজ শিষ্যগণকে লইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিলেন।

শঙ্করদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দ বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। মাধবদেবের তত্ত্বাবধানে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপ্ত হইল। মাধবদেব প্রত্যহ গণককুচিতে আসিয়া শঙ্করদেবের পরিবারবর্গের সংবাদ লইয়া যান। রতিকান্ত প্রভৃতি শঙ্করদেবের কয়েকজন জ্ঞাতি একদিন মাধবকে বলিলেন, "ওহে মাধব, তুমি প্রত্যহ এখানে আসা-যাওয়া কর কেন? এরূপ করা ভাল নয়।" তাহা শুনিয়া মাধবদেব অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইয়া গুরুপত্নীকে বলিলেন, "আমি এখানে আর আসিব না, কোচবিহারে চলিয়া যাই, কারণ আপনার জ্ঞাতিরা আমাকে হিংসা করিয়া থাকেন।" গুরুপত্নী তাঁহাকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিয়া সুন্দরীদিয়াতে থাকিতে আদেশ করিলেন। মাধবদেব গণককুচি হইতে আসিয়া সুন্দরীদিয়াতে বাস করিলেন। এখানে অবস্থানকালে নারায়ণ আতার সাহায্যে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিল। অতঃপর তিনি সুন্দরীদিয়া হইতে বরপেটায় আসিয়া সত্র স্থাপন করিলেন।

মাধবদেব শঙ্করদেবের কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণকে স্বীয় ভগ্নীর সহিত বিবাহ দেন। এই হরিচরণের চতুর্ভুজ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। গুরুর দেহত্যাগের পর মাধবদেব ২৮ বৎসর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। -র্নিয়া সত্রের সংস্থাপক নারায়ণ দাস আতা বা ঠাকুর আতা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মাধবদেব গণককুচি, সুন্দরীদিয়া, বরপেটা এবং

কুচবিহারে ভেলা সত্র স্থাপন করেন। মাধবদেব বলিতেন, "যিনি কৃষ্ণের ভক্ত তিনিই শুদ্ধ।" তাঁহার মতে পূজাদি অনাবশ্যক—একমাত্র হরির নাম কীর্ত্তন করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। তিনি চিরকুমার ও ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার আদর্শের অনুকরণে আসামে কেবলীয়া (কেৱলীয়া) ভক্তগণের সৃষ্টি হয়। কৈবল্যভাব আশ্রয়হেতু ভক্তদিগকে কেবলীয়া বলা হয়। মাধবদেব শেষ জীবনে মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মরাজ্যের তিনটী বিভাগ করিয়া কোচবিহারে মধুপুর, কামরূপে বরপেটা ও উজনীয়াতে কমলাবাড়ী সত্রের প্রতিনিধিগণের প্রাধান্য প্রদান করেন।

বারজন ধর্ম্মাচার্য্য—দৈত্যারি ঠাকুর লিখিত চরিত পুঁথি ও আচার্য্য সংহতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহাপুরুষ মাধবদেব তদীয় বারজন শিষ্যকে ধর্ম্মাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন :—

বংশী গোপাল শ্রীহৰি আৰো যদুমণি।
দেবজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্র এই জন তিনি॥
মাধৱ ভাগিনা ৰামচৰণ মহন্ত।
গোপাল মথুৰা দাস গোবিন্দ নাম সন্ত॥
বিষ্ণু লক্ষ্মীকান্ত পদ্মপাণি মহোদয়।
গোপাল কেশৱ এই আচার্য্য সুনয়॥
—দৈত্যারি ঠাকুর

বংশীগোপালকশ্চৈব তথৈবচ যদুমণি।
শ্রীহরিশ্চৈব এতেবৈ বিপ্রা বেদ বিশারদঃ॥
ভাগিনেয় তস্য রামচরণ সুমহামতি।
গোপালো মথুরা দাসো গোবিন্দ তথৈবচ॥
বিষ্ণুশ্চৈব লক্ষ্মীকান্ত পদ্মপাণি তথৈবচ।
গোপালো কেশবশ্চৈব আচার্য্যাঃ হরিতৎপরাঃ॥

ইহা হইতে জানা গেল—১। দেবেরাপার সত্রের সংস্থাপক বংশী-গোপাল দেব বা দেবগোপাল; ২। লাইআটী সত্রের সংস্থাপক শ্রীহরিদেব; ৩। মাহরা সত্রের সংস্থাপক যদুমণি; ৪। দলগোমা সত্রের সংস্থাপক রামচরণ ঠাকুর; ৫। ভবানীপুর সত্রের সংস্থাপক গোপাল আতা; ৬। বারাদি সত্রের সংস্থাপক মথুরাদাস আতা; ৭। থটরা সত্রের সংস্থাপক গোবিন্দ আতা; ৮। মধুপুর, চকলেঙ, পছনীয়া প্রভৃতি সত্রের সংস্থাপক বিষ্ণু আতা; ৯। ধোপগুরি, শোয়ালকুছি প্রভৃতি সত্রের সংস্থাপক লক্ষ্মীকান্ত আতৈ; ১০। কমলাবাড়ী সত্রের সংস্থাপক পদ্মপাণি * আতা (বদুলা আতা); ১১। বড়হেমার দ সত্রের সংস্থাপক গোপাল (পরিহা বা পড়িয়া মাধব) আতৈ ও ১২। বরজহা সত্রের সংস্থাপক কেশবচরণ আতা বা ভাটকুচি আতা। মাধবদেব দেহত্যাগ কালে তৎপ্রতিষ্ঠিত এই ১২জন ধর্ম্মাচার্য্যের মধ্যে মথুরাদাস আতাকে বরপেটা ও গণককুচি সত্রের ভারার্পণ করেন।

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় এক্ষণে আমরা এই ১২জন ধর্ম্মাচার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীহরিদেব ও পরিহা মাধব আতৈয়ের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম :—

শ্রীহরি দেব

মাধবদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্রীহরিদেব ১৪৬২ শকে লেটেকু-পুখুরীর সন্নিকটে নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীকান্ত দেব। কামতাপুররাজ দুর্লভ-নারায়ণের রাজত্বকালে কনৌজ হইতে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রসম্ভূত রঘুপতি দেব আগমন করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীকান্ত দেব তাঁহারই বংশধর। শ্রীহরি দেব চৌদ্দ বৎসরকাল সুন্দরীদিয়াতে মাধব-দেবের নিকট অবস্থান করত ধর্ম্মালোচনা করেন। মাধবদেব ইঁহাকে

* পদ্মপাণি কোচবিহারস্থ ভেলাসত্রে মাধবদেব যখন অবস্থান করিতেছিলেন, কেশবচরণ বা ভাটকুচি আতা তখন পদ্মপাণিকে ইঁহার নিকট আনয়ন করেন।

ধর্ম্মাচার্য্যরূপে বরণ করিয়া উজনীয়া অঞ্চলে পাঠাইয়া দেন। শ্রীহরি দেব মাজুলী দ্বীপে গিয়া 'লাইআটী' সত্র স্থাপন করেন। ইনি পিসতুতো ভাই বংশীগোপাল দেবের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীহরিদেব ভ্রাতুষ্পুত্র রামদেব (২০) কে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে বীতস্পৃহ ছিলেন। ইনি প্রথমবার শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া তথা হইতে 'মাধব রায়' নামক বিগ্রহ লইয়া যান। শ্রীহরি দেব ১৫৮১ শকের কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে লাইআটী সত্রে দেহত্যাগ করেন।

পরিহা মাধব আতৈ

মাধবদেবের সুন্দরীদিয়া সত্রে অবস্থানকালে মদ্রদেশ (আধুনিক মান্দ্রাজ) হইতে 'পরিহা (পঢ়িয়া) মাধব' নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ কায়স্থ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া আধুনিক গৌহাটীর পূর্ব্বদিকস্থ বেলতলার নিকট বান্দা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে কোচরাজ নরনারায়ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বান্দাগ্রামে কিছুকাল অবস্থানের পর পরিহা মাধব ঘটনাচক্রে সুন্দরীদিয়া সত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে মাধবদেবের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। মাধবদেব তাঁহাকে ধর্ম্মপরায়ণ বুঝিতে পারিয়া কিছুদিন সুন্দরীদিয়াতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। মাধবদেবের প্রভাবে তিনি মহাপুরুষ শঙ্করদেবের নিকট হইতে 'এক শরণধর্ম্ম' গ্রহণ করেন। অনন্তর মাধবদেব তদীয় এই ধর্ম্মবন্ধুটীকে 'মহন্ত' উপাধি প্রদান করিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরস্থ কোন স্থানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করেন। পঢ়িহা মাধব তৎক্ষণাৎ সানন্দে এই ধর্ম্মবন্ধুর উপদেশ পালনে ব্রতী হইয়া

(২০) রামদেব—ব্রহ্মসৈন্যের আসাম আক্রমণের পর হইতে ইঁহার বংশধরগণ নগাঁও জেলায় বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা মহাপুরুষীয়া হইলেও ইঁহাদিগের প্রসঙ্গ-পদ্ধতি অন্যান্য মহাপুরুষীয়া গোস্বামীগণের আচরিত প্রসঙ্গ-পদ্ধতি হইতে ভিন্ন।

সেখানে প্রথমে 'বড় হেমার দ' সত্র * স্থাপন করেন। এই সত্রে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার গোপাল, মুরারী, কৃপালু ও হরিবল্লব নামে চারি পুত্র হইয়াছিল। এই গোপালের পুত্রের নাম হরিকৃষ্ণ। তদীয় বংশধর শ্রীযুত শান্তিরাম মহন্ত খরদুয়ার মৌজাস্থ লাংটা সত্রের বর্ত্তমান (১৯২৪ সাল) অধিকারী। যাহাহউক—পরিহা মাধব্ আতৈ লিখিত কোন পুঁথি পাওয়া যায় না।

মাধবদেবের বিশেষত্ব

মাধবদেব যদিও শঙ্করদেবের অত্যন্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ ভক্তিপূর্ণ মনে পালন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিজ বিবেক (২১) ও মতের স্বাতন্ত্র্য কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। গুরুর উপদেশ কিভাবে গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে 'নাম ঘোষা'তে তাঁহার অভিমত পাওয়া যায়:—

তুমি হরি কৃপাময় বাহিরত গুরুরূপে
অনুগ্রহ করি আছা মোক।
অন্তর্য্যামী গুরুরূপে তাকে সত্য করা মোর
তয় নামে সদা রতি হোক॥
শাস্ত্রগুরু উপ- দেশে শিষ্য সবে
ঈশ্বরক নেদেখয়।
বুদ্ধিক সত্ত্বস্থ করিয়া আপোন
আত্মাক দেখে নিশ্চয়॥

উপরিউক্ত পদ হইতে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র গুরু বা শাস্ত্রের উপদেশ ঈশ্বরলাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে, নিজ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা

---

* বড় হেমার দ সত্র—এই সত্রটী কামরূপের পলাশবাড়ী থানার এলাকাধীন।

(২১) বিবেক—মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচার স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" অর্থাৎ—বেদ স্মৃতি সদাচার এবং বিবেক এই চারিটী সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ।

বিবেককেও প্রয়োগ করিতে হইবে, তবে আত্মদর্শন অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হইবে।

মুখে মুখে কবিতা ও গীত রচনায় মাধবদেবের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন অদ্বিতীয় স্বভাব-কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার যখন তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করেন, মাধবদেব তখন তাঁহার সহগামী হন। শঙ্করদেব পথিপার্শ্বে জনৈক ব্যক্তিকে কৃষিকার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঐ ব্যক্তি কি করিতেছে?' মাধবদেব বলিলেন, 'কৃষিকাজ করিতেছে।' শঙ্করদেব বলিলেন, ''আমাদেরও এক প্রকার কৃষিকাজ করিতে হইবে।'' মাধবদেব তৎক্ষণাৎ পতিত মানব-জমিতে কৃষিকাজ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত গীতটী মুখে মুখে রচনা করেন :—

মাধবদেবের প্রতিভা

কিবিধি কৰ আলো মনাই হৰিচৰণ
সেবাৰ পৰম সুখে।
যতন কৰিয়া হৰিৰ নাম সদা ভাব মুখে॥
অৰুণ বৰণ হৰিৰ চৰণ সদায় চিন্ত মনে।
খৰে নামাৰে বানে নেনে ফলে ছলে বনে॥
হেন কিবিধি তেজিয়া মনাই কোন কিবিধি কৰ।
খৰে মাৰিৰ বানে দুঃখ পায় কেনে মৰ॥
ভাল খেতখানি হৰিৰ চৰণ বতৰ বান্ধিয়া লৈয়ো।
যেমন বলি তেমন হয় যতন কৰিয়া বৈয়ো॥
হৰিৰ চৰণে যি শস্য বলি সকল অবিনাশী।
যত খুজি তত পায় এ বৰ কিবিধি॥
সব তেজিয়া লৈয়ো মনাই সন্তৰ সঙ্গতি।
তেবেসে কিবিধি ফলে কহয় মাধব মুকথ মতি॥

মাধবদেব গুরুর আদেশে শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া সাধারণ্যে বিষ্ণুভক্তির প্রচার করিয়াছিলেন। কণ্ঠভূষণ ৺কাশীধাম হইতে বিষ্ণুপুরি সন্ন্যাসী-কৃত যে রত্নাবলীগ্রন্থ পাটবাউসীতে আনিয়া শঙ্করদেবকে দিয়াছিলেন, মাধবদেব গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অসমীয়া ভাষায় তাহার পদ রচনা করেন। এই পাটবাউসীতে তিনি 'কীর্ত্তন ঘোষা' পুঁথির অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এইখানেই তৎকর্ত্তৃক ভাগবতের অসমীয়া পদপুঁথি, ভক্তি-রত্নাবলী, জন্মরহস্য এবং সুন্দরীদিয়াতে 'নাম ঘোষা' রচিত হইয়াছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন কামরূপে অসমীয়া ভাষায় আদিকাণ্ড রামায়ণের পদ ভাঙ্গেন। মাধবদেব রচিত 'ভটিমা' ও 'বড় গীত' পাঠে সহসা হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়-দেশীয় কোন বৈষ্ণবকবি তাঁহার ন্যায় ভক্তিভাবোদ্দীপক ভটিমা ও বড় গীত এপর্য্যন্ত প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মহাপুরুষ শঙ্করদেব রচিত কোন গীতি-কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের 'প্রেমচাতুরি'র আভাষ পাওয়া যায় না, কিন্তু মাধবদেব তাঁহার কোন কোন গীতি-কবিতায় এই বিষয়ের আভাষ দিয়াছেন। শঙ্করদেবের 'কীর্ত্তন' লেখার যে উদ্দেশ্য তদীয় শিষ্য মাধবদেবের 'নাম ঘোষা' লিখিবারও সেই উদ্দেশ্য।

মাধবদেবের গ্রন্থ ও গীত

আদি চরিত—ইহা শঙ্করদেবের অন্যতম চরিত পুঁথি। মাধবদেব ইহার লেখক বলিয়া উল্লেখ আছে। আদি চরিতে শঙ্করদেবের বংশাবলী বিপরীতভাবে বিবৃত আমরা দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুঁথির বিবরণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। একারণ আদি চরিত মাধবদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। পাঠকগণের অবগতির জন্য শঙ্করদেব চরিতে আমরা এবিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

পরিশিষ্ট

নবম পৃষ্ঠায় আমরা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণকারের বিভিন্ন মতের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম অধ্যায়ের ধর্ম্মপ্রকরণে ২১২ শ্লোকের অপরার্ক-টীকায় মৎস্য পুরাণোক্ত যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মা সকল শাস্ত্রের প্রথমেই 'পুরাণ' স্মরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে বেদ চতুষ্টয় বিনির্গত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রিবর্গসাধন শতকোটী শ্লোকাত্মক একখানি মাত্র পবিত্র পুরাণ (২২) হইল। তাহার মর্ম্মমাত্র সংগৃহীত হইয়া এই মর্ত্ত্যলোকে সংক্ষেপে চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমাণ যথা :—

মৎস্য পুরাণে—পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রানাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাযস্য বিনির্গতাঃ ॥
পুরাণমেকমেবাসীৎ তস্মিন্ কালন্তরেঽপি চ
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরং ॥
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষে সংক্ষেপেণ প্রদর্শিতঃ
পুরাণাপি দশাষ্টৌচ সাম্প্রতং তদাহোচ্যতে ॥

—(যাজ্ঞবল্ক্য, অপরার্ক, ১ অঃ ৮ প্রঃ ২১২)

বিভিন্ন পুরাণে সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত কল্পকল্পান্তরের ঘটনজনিত বৈষম্য মাত্র—অর্থাৎ, এক কল্পে বা মন্বন্তরে যে প্রকারে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অপর কল্পে বা মন্বন্তরে তাঁহার দেহত্যাগ-সংক্রান্ত ঘটনায় তদপেক্ষা কিছু কিছু বৈষম্য হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং

(২২) পুরাণ—বেদের পরেই পুরাণের উৎপত্তি। আদিপুরাণ মাত্র একখানি ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ১৮খানি মহাপুরাণে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করায় তিনি বেদব্যাস নামে অভিহিত হন।

বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কল্পের ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। সৃষ্টিপ্রকরণ ও প্রলয় প্রকরণ আলোচনা করিলেও পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এইরূপ অল্প বিস্তর মত-বৈষম্য বা ঘটনা-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল স্থলে টীকাকার, ভাষ্যকার প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ কল্প কল্পান্তরীন ঘটনা স্বীকার করিয়াই সেই সকল বৈষম্যের সমাধান করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কল্পান্তে প্রলয়-কালে সমস্ত জীব প্রকৃতির গর্ভে এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে বিলীন হন। তৎকালে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। পরবর্ত্তী কল্পের প্রারম্ভে যখন ব্রহ্ম হইতে পুনর্ব্বার প্রকৃতির বিকাশ হয়, এবং প্রকৃতি হইতে সেই সমস্ত জীবের পুনরাবির্ভাব হয়, তৎকালে সাধারণতঃ তাহাদিগের উৎপত্তির সামঞ্জস্য থাকিলেও কোন কোন অবান্তর বিষয়ে কিছু কিছু বৈষম্য বা পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। বালিকা যেমন সমস্ত দিন কতকগুলি পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করার পর সেই সকলকে আপন পেটিকা মধ্যে আবদ্ধ করে এবং পুনর্ব্বার পরদিন ক্রীড়াকালে এই সকল পুত্তলিকা পেটিকা হইতে বাহির করিয়া আবার ক্রীড়া আরম্ভ করে, কিন্তু পূর্ব্বদিনের ক্রীড়ার সহিত এই পরদিনের ক্রীড়ার সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সাম্য বা সামঞ্জস্য থাকে না, প্রকৃতির লীলাখেলাও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন (জাননি)

আসাম প্রসঙ্গ প্রাপ্তির ঠিকানা—

(১) শ্রীযুত মূর্ত্তিচন্দ্র দেব গোস্বামী ; শ্রীশ্রীআহতগুরি সত্র। পোঃ আঃ—আহতগুরি (Ahatguri). জেলা শিবসাগর ; আসাম।

(২) শ্রীযুত দণ্ডীরাম দত্ত—ম্যানেজার মাধব এজেন্সি। পোঃ আঃ—বেলসর (Belsor) ; জেলা—কামরূপ, আসাম।

(৩) ম্যানেজার, সিটি বুক সোসাইটী। ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৪) শ্রীযুত অমরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী ; গ্রাম ও পোঃ আঃ—ঘাটেশ্বরা (Ghateshwara) ; জেলা—২৪ পরগণা।

পণ্ডিত দণ্ডীরাম দত্ত প্রণীত কয়েকখানি পুস্তক (অসমীয়া)।

১। বত্রিশ পুতলা—।/০ আনা ; ২। নতুন ধাৰাপাত—(২য় সংস্কৰণ)-৵০ ; ৩। কৌতুক (অদ্ভুত গণনা)—।৵০ ; ৪। মৌখিক—/১০ ; ৫। কলেৰা আৰু বসন্তৰ ঔষধ—৵৫ পয়সা।

উক্ত পুস্তকত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত, জে, বৰুয়া—আৰল ল কলেজৰ প্রিন্সিপ্যাল ; শ্রীযুত বাণীকান্ত কাকতি—কটন কলেজৰ প্রফেসৰ আৰু প্রভাত, চেতনা ও অন্যান্যৰ ভাল মন্তব্য আছে।

ঠিকানা—মাধব এজেন্সি

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দত্ত। পোঃ আঃ—বেলসর। জেলা—কামরূপ ; আসাম।

বান্ধব প্রেছ ও বৰুয়া এজেন্সি—যথাসম্ভব মূল্যে অসমীয়া, ইংরাজী সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় সকল রকম কাজ ছাপাইয়া দেওয়া হয়। আমরা অর্ডার সাপ্লাইং এর কাজও করি। পত্রের দ্বারা নিয়মাবলী জ্ঞাতব্য। ঠিকানা—শ্রীমুকুন্দমল্ল বৰুয়া—ম্যানেজার বান্ধব প্রেস। পোঃ আঃ—নলবাড়ী। জেলা—কামরূপ ; আসাম।